হিজড়াদের সমাজবিচ্যুতি ও পেশাগত অভিযোজন প্রবণতা: একটি লোকসাংস্কৃতিক অন্বেষণ

প্রদিতি রাউত প্রমা*

গবেষণা-সারসংক্ষেপ: শারীরিক বা মানসিকভাবে লৈঙ্গিক বৈশিষ্ট্যের ভিন্নতার কারণে একজন হিজড়াকে মূল সমাজ থেকে বিচ্যুত হয়ে যেতে হয় বয়ঃসন্ধিতে। ফলে সামাজিকভাবে যেমন তাঁকে নতুন সমাজে অভিযোজিত হতে হয়, তেমনি সমাজে প্রচলিত পেশাগুলোতে তাঁর জায়গা না হওয়ায় পেশাগতভাবেও তাঁকে পুনরায় অভিযোজিত হতে হয়। এই গবেষণার উদ্দেশ্য, হিজড়াদের অপ্রাতিষ্ঠানিক যোগাযোগব্যবস্থায় ও পেশায় লোকসাংস্কৃতিক প্রবণতা অন্বেষণ, হিজড়াবৃত্তির সাথে সামাজিক ক্ষমতাকাঠামোর সম্পর্ক অন্বেষণ। গবেষণাটি কনসেপচুয়াল ফ্রেমওয়ার্ক বা ধারণাগত কাঠামো পদ্ধতিতে সম্পন্ন করা হয়েছে; যেখানে উপনিবেশবাদ, ক্ষমতাকাঠামো এবং মনঃসমীক্ষণ তত্ত্ব ব্যবহৃত হয়েছে। হিজড়ার সেই পরিচয় নির্মাণে সবচেয়ে বড় ভূমিকা রাখে সমাজ। লৈঙ্গিক সত্তায় ভিন্ন যে কাউকে হিজড়া হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। সেই ভিন্ন মানুষগুলো সংখ্যায় কম হওয়ায়, বাউল সম্প্রদায়ের মতো সমাজবিচ্যুত হতে হয়। গ্রহণ করতে হয় ভিন্ন পেশা, যা হিজড়া সমাজে পরম্পরাগতভাবে প্রচলিত। এই সম্পূর্ণ অভিযোজন প্রক্রিয়ার পেছনে মূল সমাজের ক্ষমতাকাঠামোগত আধিপত্য ও সংখ্যাগুরুর ঔপনিবেশিক মন দায়ী। অপ্রাতিষ্ঠানিক যোগাযোগ, স্বতন্ত্র সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য এবং একই বৈশিষ্ট্য নিয়ে একে অন্যের সঙ্গে যুক্ত থাকায় হিজড়াগোষ্ঠী একটি লোকগোষ্ঠী। তাঁদের সমাজবিচ্যুতি ও পেশাগত অভিযোজনও লৌকিক উপাদান এবং পরম্পরাগত স্বতন্ত্র 'লোর' দ্বারা প্রভাবিত।

চাবিশব্দ: হিজড়া, উপনিবেশবাদ, ক্ষমতাকাঠামো, জেন্ডার, লোকসংস্কৃতি।

Abstract: Due to physical or mental differences in sexual characteristics, Hijras have to be uprooted from the mainstream society at puberty. As a result, socially they have to adapt to the new society and they also have to re-adapt professionally as they do not have a place in the social conventional professions. The objectives of this article are to investigate the folk-cultural trends in informal communication systems and occupations of Hijras and explore the relationship of Hijras with social power structures. The research has been carried out in a conceptual framework where colonialism, power structure and psychoanalytic theories are taken into account. Society plays a major role in the construction of the Hijra's identity, identifying anyone who

* গবেষণা সহকারী (২০২০-২০২১ শিক্ষাবর্ষ), বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, ঢাকা।
ই-মেইল: proditiproma255@gmail.com

> differs in gender identity as a hijra. As those 'different' people are few in number, they become outcast like 'Baul'. One has to adopt a different profession, which is traditionally practised in the Hijra community. The power structure of the mainstream society and the colonial mind of the majority are responsible for this entire process of adaptation. Hijra groups are connected to each other by informal communication, cultural diversity and common characteristics like a folk group. Their socialization and professional orientation are also influenced by folk elements and traditional 'lore'.

লৈঙ্গিক ভিন্নতার জন্য হিজড়া সমাজ মূলস্রোত থেকে এক প্রকার বিতাড়িত। সমাজের কোনো একটি স্বাভাবিক পরিবারে জন্ম নিয়েও লৈঙ্গিক কারণে সমাজচ্যুত হয়ে তাঁরা আশ্রয় নেয় একটি স্বতন্ত্র গোষ্ঠীর মধ্যে। ফলে তাঁদের নিজেদের মধ্যে একটি আলাদা সমাজ ও সংস্কৃতি তৈরি হয়। অন্যদিকে হিজড়ারা অনেক আগে থেকেই সামাজিক বিনোদনের সাথে যুক্ত ছিল। তাঁরা জীবিকা নির্বাহের জন্য বিভিন্ন মঙ্গল অনুষ্ঠানে নাচ-গান করত, যা পরম্পরাগতভাবে সঞ্চারিত হয়ে এখনও তাঁদের অন্যতম পেশা। বিনিময়ে তাঁরা নগদ অর্থ ছাড়াও নতুন শাড়ি, চাল ইত্যাদি পেয়ে থাকে। কিন্তু বিভিন্ন কারণে এখন জীবিকার সেই উৎস কিছুটা কমে গেছে। তাঁরা এখন ভিক্ষাবৃত্তি, বাসে-ট্রেনে 'চাঁদাবাজি', পতিতাবৃত্তিকে পেশা হিসাবে বেছে নিচ্ছে। অর্থাৎ পেশাগত জায়গা থেকে তাঁদের পুনরায় অভিযোজন ঘটছে। সেই পেশাগুলোও আবার পরম্পরাগতভাবে তাঁদের মধ্যে সঞ্চারিত হচ্ছে। ফলে বলা যায়, লোকগোষ্ঠী হিসেবে হিজড়া জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতিই লোকসংস্কৃতি।

'হিজড়া' বলতে এখানে বোঝানো হয়েছে, সেইসব মানুষকে যাঁরা বিকাশের স্বাভাবিক গতিতে একসময় না ছেলে-না মেয়ে সত্তায় পরিচিত হতে থাকে। যাঁকে হয়তো শিশু অবস্থায় মেয়ে বা ছেলে ভেবে নেয়া হয়েছিল, কিন্তু বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মধ্যে ভিন্ন সত্তা প্রবল হয়ে ওঠে। যেসব হিজড়া পরিবারের সঙ্গে থাকেন তাঁরা এই গবেষণার অংশ নন। যাঁরা পরিবার ও সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন তাঁরা এই গবেষণার অংশ। আর 'সমাজবিচ্যুত' অর্থ পরিবার ও তথাকথিত মূলধারার সমাজ থেকে বিচ্ছিন্নকরণ প্রক্রিয়া। 'পেশা' বলতে হিজড়া আদি পেশা, বিভিন্ন দলগত উপস্থাপনার মাধ্যমে অর্থ উপার্জন প্রক্রিয়া এবং বর্তমানে ট্রেনে, বাসে, রাস্তায় যে প্রক্রিয়ায় অর্থ উপার্জন করে এই দুই মাধ্যমকে বোঝানো হয়েছে। এছাড়া 'লোকসাংস্কৃতিক প্রবণতা' বলতে বুঝানো হয়েছে, হিজড়া জনগোষ্ঠীর সমাজবিচ্যুতি ও পেশাগত অভিযোজন প্রবণতার সঙ্গে ফোকলোরের সংযোগ উপস্থাপন।

সাহিত্য-পর্যালোচনা

কথাসাহিত্যিক সেলিনা হোসেনের *হিজড়া শব্দকোষ* (২০১৯) এবং জুলফিয়া ইসলামের *তৃতীয় লিঙ্গের অবস্থান* (২০১৫) বই দুটোতে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে হিজড়াদের জীবনাচার, এমনকি রূপান্তরকামীদের অবস্থান নিয়েও আলোচনা করা হয়েছে। জোবাইদা নাসরিনের *লিঙ্গ বৈচিত্র্যের বয়ান* (২০১৯) বইটিতে নারী-পুরুষ এই দ্বিবিভাজিত লিঙ্গীয় পরিচয়ের বাইরে অন্যান্য লিঙ্গীয় সত্তা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। বইটিতে কেস স্টাডি

(case study) আকারে ১১ জন ভিন্ন লিঙ্গীয় সত্তার মানুষের অভিজ্ঞতা তুলে ধরা হয়েছে। তাঁরা সামনে এনেছেন লৈঙ্গিক পরিচয়ের বহুমাত্রিকতাকে। বইটিতে নিরাপত্তাজনিত কারণে কেউ কেউ নিজের আসল নাম আড়াল করেছেন। অজয় মজুমদারের *ভারতের হিজড়ে সমাজ* (২০১১) বইটিতে বর্ণানুক্রমিকভাবে হিজড়া জনগোষ্ঠীর সামগ্রিকতা রয়েছে। তাতে তাঁদের সমাজবিচ্যুতি কিংবা পেশাগত অভিযোজন প্রক্রিয়ার কোন যথাযথ বিশ্লেষণ বা প্রতিকার খোঁজা হয়নি। নাসিম আনোয়ারের *জেন্ডার ও সামাজিক বৈষম্য* (২০১৯) বইটিতে পুরুষতান্ত্রিক সমাজ কাঠামো প্রতিপদে নারীকে কীভাবে বৈষম্যের শিকার করছে তা নিয়ে আলোচনা করেছে অথচ একই কাঠামো যে হিজড়াদের মূল সমাজের বাইরে নিয়ে যাচ্ছে তা নিয়ে কোন আলোচনা নেই। বেশিরভাগ জেন্ডার স্টাডিজের বই নারীর ক্ষমতায়ন এবং বৈষম্য নিয়ে কথা বলেছে। জেন্ডার পরিসীমায় যে হিজড়া জনগোষ্ঠীও সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ তার আলোচনা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই নেই। রোবায়েত ফেরদৌসের *বাংলাদেশের হিজড়া সমাজ: অনুধ্যান ও করণীয়* (২০১৫) গবেষণাকর্মটিতে সরকারের হিজড়া জনগোষ্ঠীর স্বার্থে করণীয় বিষয়ে একটি সার্বিক বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এই কাজটিতেও এই জনগোষ্ঠীকে মূলধারার বাইরে রাখার প্রবণতাই লক্ষ করা গেছে। বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের সমস্যা, নির্যাতন, প্রতিকার নিয়ে যতগুলো বই প্রকাশিত হয়েছে তার বেশিরভাগগুলোতেই 'যৌন সংখ্যালঘু' সম্প্রদায় অর্থাৎ হিজড়া জনগোষ্ঠীর সমস্যা নিয়ে তেমন কোন আলোকপাত করা হয়নি। যেমন: সালাম আজাদের *বাংলাদেশের বিপন্ন সংখ্যালঘু* (২০১৪) বা পঙ্কজ ভট্টাচার্য ও তপন কুমার দে'র *বাংলাদেশের সাম্প্রদায়িকতা ও সংখ্যালঘু সংকট* (২০২০) ইত্যাদি। সুধাকর চট্টোপাধ্যায়ের *Social life in Ancient India: in the Background of the Yajñavalkyâ-smriti* (১৯৬৫) এবং মনোজ রাঘোবানিসর *The Third Sex* (১৯২৭) বইটিতে ভারতীয় উপমহাদেশের অতীত ইতিহাসে মূলধারার সমাজে হিজড়া জনগোষ্ঠীর যে সম্মানের জীবন ছিল তাই বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে। ফজল মাহমুদের *Not born to the different* (২০০৯) বইটিতে হিজড়া জন্মকে 'অদ্ভুত', 'অস্বাভাবিক' ভাবার প্রতিবাদ করা হয়েছে। Amara Das Wilhem-এর *Tritiya-Prakriti: People of the Third Sex: Understanding Homosexuality,Transgender Identity and Intersex Conditions Through Hinduism* (২০০৮) বইটিতে তৃতীয় লিঙ্গের মানুষের জৈবিক, মানসিক, সামাজিক অবস্থান নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। সানজিদা ইসলামের *A Theoretical Analysis of the Legal Status of Transgender: Bangladesh perspective* (২০১৯) ও লুবনা জেবিনের *Status of Transgender People in Bangladesh: a socio-economic analysis* (২০১৯) এই দুটো প্রবন্ধে বাংলাদেশের প্রতিবেশে হিজড়াদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থান নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। হিজড়াগোষ্ঠী একটি লোকগোষ্ঠী এবং তাঁর সংস্কৃতি লোকসাংস্কৃতিক প্রভাবজাত। অথচ এই গোষ্ঠীর সংস্কৃতিকে ফোকলোরের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা হয়েছে এমন গবেষণা খুব বেশি চোখে পড়ে না। সুস্মিতা চক্রবর্তীর *ফোকলোর ও জেন্ডার: লোক-ঐতিহ্যে পিতৃতন্ত্র ও নারীর স্বতন্ত্র স্বর* (২০১৪) বইটিতেও জেন্ডারের আওতায় 'হিজড়া'কে আনা হয়নি। ফোকলোরে নারীর স্বর খোঁজা হয়েছে। কিন্তু হিজড়াপেশা ও হিজড়াদের সাংস্কৃতিক এবং সামাজিক অভিযোজনকে লোকসাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে দেখানো হয়নি। অন্বেষণ করা হয়নি তার পেছনের ক্ষমতাকাঠামো কিংবা

উপনিবেশিত মন ও সমাজের প্রভাব। তাত্ত্বিক কাঠামোর আলোকে ফোকলোর বিদ্যায়তনিক জায়গা থেকে হিজড়াদের সাংস্কৃতিক অভিযোজন ও পেশার ধরন নির্ণয় ও বিশ্লেষণ এই গবেষণার মুখ্য বিষয়।

গবেষণা-পদ্ধতি

বর্তমান প্রবন্ধে হিজড়াদের পেশার সাথে যুক্ত বিভিন্ন লৌকিক উপস্থাপনার ধরন এবং পারস্পরিক অনানুষ্ঠানিক যোগাযোগের (হিজড়াদের নিজেদের ও হিজড়াদের সাথে অন্য গোষ্ঠীর) ধরন ও কারণ খুঁজে বের করে পর্যালোচনা, হিজড়াবৃত্তির সঙ্গে সামাজিক ক্ষমতাকাঠামোর সম্পর্ক খুঁজে বের করা এবং হিজড়াদের সমাজবিচ্যুতি ও পেশায় লোকসাংস্কৃতিক প্রবণতা অন্বেষণ মূল বিবেচ্য। এজন্য কনসেপচুয়াল ফ্রেমওয়ার্ক বা ধারণাগত কাঠামো পদ্ধতিতে গবেষণাটি করা হয়েছে। এছাড়া প্রবন্ধটিতে হিজড়াদের লোকগোষ্ঠীগত বৈশিষ্ট্য, সমাজবিচ্যুতকরণ ও অভিযোজন প্রক্রিয়া, তাঁদের পেশাগত পট-পরিবর্তনের সঙ্গে সামাজিক ক্ষমতাকাঠামোর সংযুক্তি এবং উপনিবেশবাদ, ক্ষমতাকাঠামো, মনঃসমীক্ষণ তত্ত্বের সাথে হিজড়াগোষ্ঠীর সমাজবিচ্যুতি ও অভিযোজন প্রক্রিয়ার সম্পর্ক উদ্‌ঘাটনেরও প্রয়াস রয়েছে। তাই গবেষণাটি মিশ্র পদ্ধতিতে (mixed method) করা হয়েছে। ৪০ জন হিজড়াকে নিয়ে পরিমাণগত গবেষণা (quantitative method) এবং গুণগত গবেষণা (qualitative research) পদ্ধতিতে গবেষণাকর্মটি করা হয়েছে।

গবেষণা-তত্ত্ব

মিশেল ফুকোর (১৯২৬-১৯৮৪) ক্ষমতাকাঠামো, সিগমুন্ড ফ্রয়েডের (১৮৫৬-১৯৩৯) মনঃসমীক্ষণতত্ত্ব, উপনিবেশবাদ তত্ত্ব ব্যবহার করা হয়েছে। প্রাইমারি উৎসের জন্য ক্ষেত্রসমীক্ষার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এতে সাক্ষাৎকার, পর্যবেক্ষণ ও এফজিডি (ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন) পদ্ধতিগুলো ব্যবহার করা হয়েছে। সাক্ষাৎকারের ক্ষেত্রে কাঠামোবদ্ধ এবং অ-কাঠামোবদ্ধ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। গবেষণার জন্য ৪০ জন হিজড়ার পেশার উপর একটি সার্ভে করা হয়েছে। কিন্তু তথ্যগত ভিন্নতার উপর ভিত্তি করে প্রবন্ধে কেবল সাতজনের উদ্ধৃতি রাখা হয়েছে। তথ্যদাতাদের অনুমতি নিয়েই হিজড়াগোষ্ঠীর সদস্যদের নাম ব্যবহার করা হয়েছে। নামগুলো পরিবারিক নাম নয়, বরং হিজড়া ডেরায় যাওয়ার পর, নতুন যে নাম তথ্যদাতাদের দেয়া হয়েছে সেই নাম। সেকেন্ডারি উৎস হিসেবে বিভিন্ন বইপত্র, সার্ভে, ডকুমেন্টারি, খবর ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়েছে। গবেষণা এলাকা হিসেবে ময়মনসিংহ জেলা সদর ও এর অন্তর্ভুক্ত ত্রিশাল উপজেলা এবং নেত্রকোনা জেলা সদর নির্বাচন করা হয়েছে।

হিজড়াজনগোষ্ঠীর লৈঙ্গিক আশ্রয়: একঘরে বাউলের উত্তরাধিকার

বাঙালি সংস্কৃতিকে সমন্বয়ধর্মী সংস্কৃতি বলা যায়। বহুবিধ এবং বিচিত্র উপাদানের সমন্বয়ের ফলে বাঙালির সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সৃষ্টি হয়েছে। ঐতিহাসিক বঙ্গভূমি বা বাংলাদেশে (বর্তমানে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ ও স্বাধীন রাষ্ট্র বাংলাদেশ) অঞ্চলে সুপ্রাচীনকাল থেকে

বিভিন্ন নরগোষ্ঠী এসে বসবাস করতে শুরু করেছে। এই সব নরগোষ্ঠী সঙ্গে নিয়ে এসেছে তাঁদের নিজস্ব সাংস্কৃতিক উপাদান। এসব বহিরাগত উপাদান বা উপকরণের সঙ্গে দেশজ উপাদানের সংমিশ্রণ ও সমন্বয় হয়েছে; এবং এর ফলেই সংস্কৃতির রূপান্তর ঘটেছে। বাঙালি সমাজ এইসব সংস্কৃতিকে মূলধারার সংস্কৃতিতে জায়গা দেয়ার উদারতা দেখালেও, আলাদা সংস্কৃতির কারণে একঘরে করার নজিরও রয়েছে। যেমন: বাউল-সংস্কৃতি বা বাউল-ধর্ম মানুষ গ্রহণ করতে পারেনি। বৈচিত্র্যের প্রতি মূলস্রোতের অনীহার কারণেই বাউলদের একঘরে হতে হয়েছে। সেই বৈচিত্র্য হতে পারে শারীরিক, মানসিক অথবা কেবল দর্শনগত। বাউল একঘরে হয়ে নতুন এক সংস্কৃতি, নতুন জীবিকা তৈরি করেছে। হিজড়াগোষ্ঠীর ক্ষেত্রেও একই ঘটনা ঘটে।

একজন শিশু জন্মের পর নিজের জেন্ডার পরিচয় নিজে নির্ণয় করতে পারে না। তার শরীর দেখে সে নারী নাকি পুরুষ, নাকি তার যৌনাঙ্গ বিকৃত তা ঠিক করে দেয় পরিবার ও সমাজ। কিন্তু শুধু শারীরিক পরিচয় দিয়ে একজন মানুষ নারী নাকি পুরুষ তা নির্ধারণের সুযোগ নেই। এর মাধ্যমে বিশেষত নারী-পুরুষ 'বাইনারি'র বাইরের মানুষদের চিহ্নিত করা আরো কঠিন হয়ে পড়ে। সমাজে 'নারী' ও 'পুরুষ' দুই সত্তা সাংস্কৃতিকভাবে নির্মিত। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে তথাকথিত 'নারী' ও 'পুরুষ' এর যে প্রচলিত স্টেরিওটাইপের বাইরে সবাইকে 'অন্য' এবং 'অস্বাভাবিক' হিসেবে ধরা হয়। হিজড়া যতটা না শারীরিক বিষয়, তার চেয়ে বেশি মানসিক বিষয়। শুধু শারীরিকভাবে 'বিকৃত' মানুষ হিজড়া নয়, যে শরীরে পুরুষ কিন্তু মনে নারী বা যে শরীরে নারী ও মনে পুরুষ সে-ও হিজড়া। ভারতীয় উপমহাদেশে বেশিরভাগ রূপান্তরকামী মানুষও হিজড়া হিসাবেই পরিচিত। পরিচয় প্রকাশ হওয়ার পর, তাঁরাও সমাজে একঘরে হয়ে যায়।

বাউলরা শাস্ত্রীয় ধর্ম পালন করে না। মূলত, শাস্ত্রীয় ধর্মের প্রতিবাদেই 'লোকধর্ম' গড়ে ওঠে। বাউল সংস্কৃতির প্রাণবীজ থাকে লৌকিক জীবনে ও লোকায়ত যাপনে। বাউল ধর্ম বা দর্শনের প্রধান বৈশিষ্ট্য:

১. পরলোকের চাইতে ইহলোকের গুরুত্ব বেশি।

২. অনেক ক্ষেত্রেই অসাম্প্রদায়িক, লৌকিক। দেব-দেবীর পূজা জাত-পাত মানে না।

৩. পুরোহিত নির্ভর নয়।

৪. মন্ত্রের চেয়ে গীত, পুঁথির প্রাধান্য বেশি।

৫. ভাব বাদের চেয়ে বস্তুবাদ গুরুত্বপূর্ণ।

৬. বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই নিম্ন জীবনের শিকড়পুষ্ট।

৭. শাস্ত্রবিরোধীতা লক্ষণীয়।

৮. মানবিক বিশ্বাসের ভিত আছে।

৯. অনুমানের চেয়ে বর্তমান, আত্মার চেয়ে দেহের গুরুত্ব বেশি। (শাস্ত্রী, ১৯৪৯, পৃ. ৮৬-৮৮)

প্রচলিত সমাজব্যবস্থার বেশিরভাগ মানুষ উপরোক্ত দর্শনের সাথে একমত নয়, বিশ্বাসীও নয়। ফলে সমাজের মূলধারার বা সংখ্যাগরিষ্ঠ শাস্ত্রীয় ধর্ম পালনকারীদের কাছে বাউলরা একঘরে হয়েছে।

> আমরা পাগল, আমাদের কথা ছাড়িয়া দাও। পাগলের তো কোনো দায়িত্ব নাই। বাউল অর্থ বায়ুগ্রস্ত, অর্থাৎ পাগল। আর তাঁহারা বলেন, "মনে করিও যেন আমরা সামাজিক হিসাবে মরিয়াই গেছি।" (শাস্ত্রী, ১৯৪৯, পৃ. ১৫)

একইভাবে লৈঙ্গিক বৈচিত্র্যের কারণে হিজড়া জনগোষ্ঠী সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন, আলাদা মহল্লায় ভিন্ন সংস্কৃতিতে তাঁরা জীবন কাটায়। বাউলরা জীবন কাটায় বিচ্ছিন্ন আখড়ায়। সকল জাত-পাতের মানুষ একই আখড়ায় একসঙ্গে বসবাস করে। তাঁদের জীবনের প্রতি দর্শন, বিশ্বাসের মিল থাকে। একই সমাজের ভেতর থেকেও তাঁদের অস্তিত্ব ভিন্নঃ

> প্রেমাস্পদের উদ্দেশ্যে সংসারত্যাগী ও উন্মাদ হয়ে গান গেয়ে বেড়ানোর কারণে তাঁদেরকে বাউল বলা হয়। গান-বাজনা হ'ল তাঁদের ধর্মপ্রচারের একমাত্র মাধ্যম। বিভিন্ন খানকা, মাযার, আখড়া তাঁদের ধর্ম প্রচারকেন্দ্র। (করীম, ২০০২, পৃ. ১৫-১৭)

একইভাবে হিজড়া জনগোষ্ঠীর ভেতরেও ধর্মীয় পরিচয়ের কারণে কোনো আলাদা ডেরা তৈরি হয় না। বিভিন্ন অঞ্চলের, ভিন্ন ভিন্ন ধর্মাবলম্বী মানুষ গুরু-মার আশ্রয়ে হিজড়া ডেরা বা মহল্লায় আশ্রয় নেয়। যে-কোনো হিজড়া বাড়িতেই দেখা মিলবে সব ধর্মের হিজড়ার। সব ধর্মের দেব-দেবীই তাঁদের উপাস্য। হিজড়া সমাজে যে-ধর্মের সন্ধান পাওয়া যায়, তাকে মিশ্র-ধর্ম বলাই সঙ্গত। হিন্দু ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে ইসলামি ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান সম্পৃক্ত হয়ে এক বিশেষ ধর্ম-বিশ্বাস সৃষ্টি করেছে। এই ধর্ম-বিশ্বাসকে বিশ্লেষণ করলে চারটি ধারার সন্ধান পাওয়া যায়ঃ

১. মাজার-কেন্দ্রিক মারফতি সুফিধর্ম ভাবনা।
২. না-মুসলমান, না-হিন্দু, সম্পূর্ণ নিজস্ব কিছু দেব-দেবীর পুজো-পার্বণ ও ধর্মোৎসবে অংশগ্রহণ।
৩. প্রচলিত সনাতনী হিন্দু ধর্মাচরণ ও বিশেষ বিশেষ কিছু দেবদেবীর পুজো-পার্বণ। যেমনঃ ঢোল পূজা।
৪. শরীয়তি পন্থানুযায়ী কিছু বিশেষ ইসলামি ধর্মানুষ্ঠান পালন।

এই চারটি ধারা সমানভাবে ক্রিয়াশীল নয়। যদিও শাম্মী হিজড়া বলেনঃ 'আমরা যে ধর্ম থেকে আসি, গুরু-মা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করায়।' (তথ্যদাতাঃ শাম্মী, তারিখঃ ১৭-১-২০২২)। কিন্তু অন্য কোনো হিজড়ার সঙ্গে কথা বলে এমন তথ্য পাওয়া যায়নি। এই তথ্য বরং অনেক বেশি মানুষের কাছে পাওয়া যায় যে, হিন্দু-মুসলিম কেউই তাঁদের জন্মগত পাওয়া শাস্ত্রীয় ধর্ম সেখানে পালন করে না। বাউল আখড়ায় একজন গুরু থাকে, যার থেকে সকল বাউল দীক্ষা নেন। গুরু বা সাঁইকে তাঁরা ঈশ্বরের অবতার মনে করেন। বাউল যেহেতু ধর্মীয় দর্শনের উপর ভিত্তি করে তৈরি গোষ্ঠী, তাই সমাজবিচ্ছিন্ন জীবনে গুরুকে ঈশ্বরের প্রতিরূপ ভাবে। কিন্তু হিজড়াগোষ্ঠী ধর্মীয় কারণে আলাদা নয়, লৈঙ্গিক কারণে আলাদা। তবে হিজড়া জনগোষ্ঠীর মধ্যেও একজন গুরু থাকে। শিষ্যরা গুরু-মাকে মান্য

করেন। হিজড়াগোষ্ঠীর বাকি সদস্যরা তাকে মা বলে ডাকেন। বাউলদের নিজস্ব গানে মানবতাবাদ থাকে, আবার সমাজের ধরাবাঁধা নিয়মের বিরুদ্ধে প্রতিবাদও থাকে। হিজড়াদের গানে ততটা তীব্র প্রতিবাদ না থাকলেও নিজের অবদমন, বঞ্চনা সেই গানে তীব্রভাবে ফুটে ওঠে।

গ্রামে বাউলেরা হাতে একতারা নিয়ে বাড়ি বাড়ি গান গেয়ে ভিক্ষা করে জীবনধারণ করেন। অন্যদিকে হিজড়াদেরও প্রধান উপার্জন তাঁদের ভাষায় 'কালেকশন' করা। এটাও একধরণের ভিক্ষাবৃত্তিই; শুধু কৌশলটা বাউলদের মত সৌম্য নয়। বাউলরা ভাসমান, একেক সময় একেক অঞ্চলে গিয়ে বসবাস করে। একইভাবে হিজড়াদের জীবন ও জীবিকাও ভাসমান।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে বলা যায় হিজড়াগোষ্ঠী ও বাউল গোষ্ঠী ভিন্ন সাংস্কৃতিক কারণে ভিন্ন সত্তার অধিকারী হলেও মূলস্রোতের বাইরে তাঁদের বেঁচে থাকার লড়াইয়ে অনেক সাযুজ্য রয়েছে। তাই বলা যায় হিজড়া জনগোষ্ঠীর সমাজবিচ্যুতির ধরণ বাউলদের মতো।

হিজড়া লোকগোষ্ঠীর সংস্কৃতি: ক্ষমতাকাঠামোর আলোকে

দুর্বলের উপরের ক্ষমতাবানের প্রভাব যুগ যুগ ধরে এক বাস্তব সত্য। এই 'দুর্বল' ও 'ক্ষমতাবান' দুটি রাজনৈতিক প্রপঞ্চ যা শুধু অর্থনৈতিক এবং শারীরিক শক্তির বিষয় নয়। 'আমি' এবং 'অন্য'-এর বিষয়। পুরুষতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থায় পুরুষের সাপেক্ষে নারী 'অন্য' বা পুরুষ ও নারীর সাপেক্ষে 'হিজড়া' অন্য।

হিজড়াদের সমাজবিচ্যুতি: উপনিবেশবাদের আলোকে

সমগ্র পৃথিবী জুড়েই বহু প্রাচীন সময় থেকে তুলনামূলক কম শক্তিশালীকে অধস্তন করে রাখার রাজনীতি বিদ্যমান; বিশেষ করে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়, বৈচিত্র্যপূর্ণ মানবগোষ্ঠী কিংবা অর্থনৈতিকভাবে পশ্চাৎপদ গোষ্ঠী। সাম্রাজ্যবাদী শক্তি যেমন নিজ স্বার্থ রক্ষার্থে অধিকৃত এলাকার রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক জীবন নিয়ন্ত্রণ করে তেমনি মানসিকভাবে একটি সাম্রাজ্যবাদী মনোভাব নিয়ে 'সংখ্যালঘু'দের উপর এক ধরনের উপনিবেশ স্থাপন করে বসে সংখ্যাগরিষ্ঠরা। সংখ্যালঘুদের জীবন প্রত্যক্ষভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ বা মূলধারার মানুষ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত না হলেও পরোক্ষভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়।

ইয়াকুত ই-জাবিন কলোনি বা উপনিবেশবাদ সম্পর্কে বলেন:

> প্রকৃত অর্থে Colony হল এমন একটি অনুশীলন যা দ্বারা কোনো রাষ্ট্র যখন তার নিজ দেশের বাইরের কোনো ভূখণ্ডে বসতি স্থাপন ও প্রশাসনিক কাঠামো গঠনের মাধ্যমে সেই ভূখণ্ডে বসবাসকারী জনগণকে শাসন ও শোষণ করে। তখন সেই দখলকৃত ভূখণ্ডকেই বলা হয় উপনিবেশ (Colony)। অর্থাৎ এক ধরনের দখলদারিত্ব প্রতিষ্ঠা করা যেখানে সামাজিক সাংস্কৃতিক আগ্রাসন চালানো হবে। (Ashcroft, 2013, P. 12)

তবে এর পেছনে প্রধান উদ্দেশ্য– কম শক্তিশালী দেশের উপর কর্তৃত্ব স্থাপন। কিন্তু উপনিবেশিত দেশ নিজেও একসময় এই কর্তৃত্ব স্থাপনকে স্বাভাবিক ভেবে নেয়। উপনিবেশ না থাকলেও তো পাশ্চাত্যের বেঁধে দেয়া 'ঠিক', 'ভুল', 'উচিত', 'অনুচিত'-কে মানসম্মত

মনে করা হয়। অর্থাৎ উপনিবেশিত ব্যক্তির মনও এতে অভ্যস্ত হয়ে যায়। উপনিবেশবাদের মূল কথাই হলো অসাম্য। উপনিবেশবাদ প্রত্যক্ষভাবে শেষ হয়ে গেলেও পরোক্ষভাবে এই উপনিবেশবাদ পৃথিবীর উপর, মানুষের উপর গভীর ছাপ ফেলেছে বিভিন্নভাবে। উপনিবেশ সম্পর্কে রবার্ট ইয়ং বলেন: "Colonialism is cultural and economical imperialism." (Said, 1994, P. 10)। অর্থাৎ উপনিবেশবাদ হলো সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদ। কিন্তু এই সাম্রাজ্য শুধু একটি দেশ অন্য একটি দেশের উপর চর্চা করে না, বরং একটি সমাজেও অধিক শক্তিশালী মানুষ কম শক্তিশালী মানুষের উপর চর্চা করে থাকে। উপনিবেশী শাসনের কারণে উপনিবেশ ও উপনিবেশিত উভয়ের মধ্যেই এক মনস্তাত্ত্বিক পরিবর্তন আসে। 'উপনিবেশিতের সাংস্কৃতিক শেকড়ের মৃত্যু ও সমাধি তার মনে জন্ম দেয় হীনমন্যতাবোধের।' (Fanon, 1986, P. 18)। কিন্তু শুধু সাংস্কৃতিক শেকড়ের মৃত্যু উপনিবেশিতদের মনে হীনম্মন্যতার জন্ম দেয় তা নয়, বরং অপেক্ষাকৃত দুর্বল গোষ্ঠী কোনো তথাকথিত 'Standard' গোষ্ঠীর মতো নয়– সেই বোধও তাকে মানসিকভাবে হীনমন্য করে তোলে।

পুরুষতান্ত্রিক পরিকাঠামো সমাজে যা যা নির্মাণ করে তা অনেকটা এরকম:

১. নারীকে পুরুষ দেখে পুরুষতান্ত্রিক দৃষ্টিতে; সামাজিক অবকাঠামো, ফোকলোরের বিভিন্ন উপাদানে তা স্পষ্ট।

২. প্রায়ই নারীকে নারীও দেখে পুরুষতান্ত্রিক দৃষ্টিতে, বিশেষত সে যখন কোনো পুরুষের প্রতিনিধিত্ব করে। যেমন: লোকছড়ায় শাশুড়ি বা ননদ-এর যে নির্মাণ।

৩. তৃতীয় লিঙ্গকে বা হিজড়ার যে সাংস্কৃতিক নির্মাণ তা-ও দেখা হয় পুরুষতান্ত্রিক দৃষ্টিতে। কোনো মেয়ে 'ছেলেসুলভ' হলে তাকে কখনো 'হিজড়া' বলে গালি দেয়া হয় না। তবে কোনো ছেলে 'মেয়েসুলভ' হলে তাকে 'হিজড়া' বলে গালি দেয়া হয়। অর্থাৎ হিজড়া সাংস্কৃতিক ভাবে কেমন হবে বা হিজড়াদের কেমনভাবে সেজে রাস্তায় বের হতে হবে তার নির্মাণ পুরুষতান্ত্রিক।

৪. এমনকি পুরুষের কার্যকলাপও নির্মাণ হয় পুরুষতান্ত্রিক দৃষ্টিতে। যেমন: ছোট থেকেই শেখানো হয় পুরুষ মানুষ ব্যথা পেলে কাঁদতে হয় না, পুরুষ মানুষের রান্না না জানলেও চলবে– কিন্তু আর্থিকভাবে সাবলম্বী হতেই হবে।

অর্থাৎ, পুরুষতান্ত্রিক অবকাঠামো এখানে শাসক বা ঔপনিবেশিক অন্যদিকে হিজড়া জনগোষ্ঠী উপনিবেশিত বা শাসিত। নারী-পুরুষ বাইনারি যৌন অভিনিবেশের বাইরে অন্য সব সত্তা যে অস্বাভাবিক ও অসামাজিক তা নারী ও পুরুষও বিশ্বাস করছে, আবার বিশ্বাস করছে হিজড়া সম্প্রদায় নিজেও। শিমু হিজড়া নামে এক হিজড়া এ বিষয়ে বলেন: 'অন্যান্য প্রতিবন্ধীদের সাধারণ মানুষ মায়ার চোখে দেখে, কিন্তু আমাদের ঘৃণা করে।' (তথ্যদাতা: শিমু, তারিখ: ১৫-১-২০২২)

বস্তুগত সুবিধাদির ভিত্তিতে যে স্তর বিন্যাস হয় তা খুব সহজে অনুমেয় কিন্তু লৈঙ্গিক বিন্যাসের ভিত্তিকে যে স্তরবিন্যাস তা সমাজের একদম গভীরে প্রোথিত। যেমন: পুরুষ,

নারী, হিজড়া। সমাজে তাঁদের অবস্থান স্পষ্ট। স্বাধীন দেশে আদিবাসী গোষ্ঠী ঠিক কীভাবে বাঙ্গালিদের দ্বারা উপনিবেশিত তা নিয়ে অনেক গবেষণা হয়েছে। কিন্তু লৈঙ্গিক বৈষম্যকে কেন্দ্র করে যে উপনিবেশ-উপনিবেশিত সম্পর্ক সমাজ ও হিজড়াদের মধ্যে গড়ে উঠেছে তা নিয়ে আলোচনা হয়নি বললেই চলে। কেননা:

> প্রাচ্যতত্ত্ব হলো নিয়ন্ত্রণের তত্ত্ব। এটা উপনিবেশবাদীদের অবস্থান জোরদার করতে প্রণোদনা যোগায়। এটি যা কিছু শুভ ও সম তা এড়িয়ে যায়। সাইদ ও অপরাপর তাত্ত্বিকরা মনে করেন এই ডিসকোর্স পরিবর্তিত আঙ্গিকে এখনো বিরাজমান। (চৌধুরী, ২০০৭, পৃ. ১৫)

গবেষকরা এই ঘটনাকে দেখাতে বা বিশ্লেষণ করতে চেয়েছেন পাশ্চাত্যের প্রতি প্রাচ্যের মোহ বা অন্ধত্ব দেখে। 'উপনিবেশবাদ' সবচেয়ে বেশি প্রভাব ফেলেছে মানুষের মনে, মস্তিষ্কে। যার ফলে সাধারণ মানুষের মধ্যে other বা অপরের ধারণা এত স্পষ্ট। 'অপর' সৃষ্টি করতে না পারলে নিজের কর্তৃত্ব ফলানো যায় না। জ্যাক লাঁকার মতে, "ব্যক্তি মানুষ কেবলমাত্র নিজের বিপরীতে 'অপরের' অস্তিত্বের সাপেক্ষেই নিজের ভেতর 'আমি' এর অস্তিত্ব নির্মাণ করতে পারে।" (Devices, 2005, P. 11)। লিঙ্গীয় ক্ষমতাকাঠামোর ক্ষেত্রেও ঘটনাটি তাই। নিজেদের ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব বজায় রাখতে 'অপর', 'অদ্ভুত', 'অস্বাভাবিক', 'অসভ্য' ইত্যাদি ধারণা তৈরি হয়।

গোটা পৃথিবীকে ক্ষমতা সম্পর্কের কাঠামোয় ফেলে দেয়া তা উপনিবেশবাদের জন্যই সম্ভব হয়েছে। উপনিবেশবাদ ভিন্ন ধরনের সমাজ-সংস্কৃতিকে কয়েকটি শব্দে বর্ণীত করে: পশ্চাৎপদ, কুসংস্কারগ্রস্ত, অশিক্ষিত, অন্ধকারাচ্ছন্ন, অসভ্য ও বর্বর।

লিঙ্গীয় ক্ষমতাকাঠামোর সাপেক্ষে পুরুষতান্ত্রিক সমাজকাঠামো বা তথাকথিত মূলস্রোতের মানুষ হিজড়াদের চিহ্নিত করে নানা বিশেষণে: যৌন প্রতিবন্ধী, ভয়ংকর, অসভ্য, অভিশাপগ্রস্ত, মুখ দেখা অশুভ, অশ্লীল, মা-বাবার পাপের ফল, বর্বর প্রভৃতি।

উপরোক্ত বিশেষণগুলো তথাকথিত স্বাভাবিক ব্যক্তিরা 'হিজড়া'দের দিয়ে থাকে। 'উপনিবেশবাদ' উপনিবেশিত রাষ্ট্রগুলোকে যা বলে চিহ্নিত করে তার সঙ্গে এর মিল অনেক এবং এই কারণ হিজড়াকে মূলস্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন করে, কখনো কখনো তার পরিবারকেও একঘরে করে দেয়।

উত্তর-ঔপনিবেশিক সময়ে নিগ্রোদের অবস্থানের দিকে তাকালে বর্তমানে 'হিজড়া'দের অবস্থান সবচেয়ে বেশি স্পষ্ট হয়। সেসময় ঔপনিবেশিক প্রভুরা দেশের জনগণকে সাদা ও কালো বিভাজনের মধ্যে ফেলে দেয়। ফলে দেখা দেয় নিগ্রোসত্তার সংকট। মনস্তত্ত্ববিদ ফ্রাঞ্জ ফ্যানোর *Black Skin, White Mask* (১৯৫২) লেখায় উঠে আসে সেসময়ের নিগ্রোদের অবস্থান:

> মা নিগ্রোটাকে দেখো! আমার ভয় লাগছে! ভীত! আতঙ্কগ্রস্ত! এখন তারা আমাকে ভয় পেতে শুরু করল। আমি এমনভাবে হাসতে চেয়েছিলাম যেন চোখ দিয়ে পানি চলে আসে, কিন্তু হাসতে আমি পারিনি।
>
> আমার চারদিকে শ্বেতাঙ্গরা, আকাশের কোণেও কান্না করছে, আমার পায়ের নিচে মাটি কাঁপছে, আর ঐ যে শ্বেত সঙ্গীত, শ্বেতাঙ্গ সঙ্গীত। এই সাদাটে সব কিছু আমাকে করে... (রশীদ, ২০১২, পৃ. ৫৮)

উপর্যুক্ত ঘটনাটি বিবেচনা করলে হিজড়াদের অবস্থানের সঙ্গে নিগ্রোদের অবস্থানের সাযুজ্য খুঁজে বের করা যায়। হিজড়া দেখলে ভয়ে কুঁকড়ে ওঠে মূলস্রোতের বেশিরভাগ শিশু। কিন্তু এই 'ভয়' শিশুটির পরিবার তাকে সচেতন ভাবে শেখায়নি। হিজড়া দেখতে, আচারে, পোশাকে, ভাষায় মূলস্রোতের মতো নয়। ফলে সে নিশ্চয়ই অস্বাভাবিক বা ভয়ংকর কিছু। শিশুদের ভয় পাওয়া দেখে একজন হিজড়ার মনেও সংশয় জাগে যে– নিশ্চয়ই স্বাভাবিক মানুষ নয় সে। তখন নিজের সত্তাকেও ঘৃণা করতে শুরু করে তাঁরা। (তথ্যদাতা: সাবিনা, তারিখ: ১৮-১-২০২২)

নতুন সমাজে অভিযোজন: ক্ষমতাকাঠামোর আলোকে

ক্ষমতা বিষয়টি অনেকটা জালের মত। বিভিন্ন অপ্রাতিষ্ঠানিক উপায়েও এটি 'ডিসকোর্স' হয়ে উঠতে পারে (যেমন: ভাষা, টেক্সট)। এই ক্ষমতা এবং ক্ষমতাকাঠামো বিভিন্নভাবে জাল বিস্তার করে থাকে। ক্ষমতা বিষয়টি সবসময় জোর-জবরদস্তির নয়। এটি অনুভূতির সঙ্গেও যুক্ত। ক্ষমতা মূলত এক ধরনের সম্পর্কের ধারণা। কোনো ব্যক্তির ক্ষমতা আছে কি নেই তা বোঝা যাবে– যখন সেই ব্যক্তি অন্য ব্যক্তিকে এমন কিছু কাজ করতে বাধ্য করতে পারে, যা সেই ব্যক্তি স্বেচ্ছায় করত না। অর্থাৎ ক্ষমতা হলো একধরনের দক্ষতা বা প্রভাব যা অপরের ওপর প্রযুক্ত হয়। অন্যের আচরণকে প্রভাবিত করতে সমর্থ হলেই তবে কারোর ক্ষমতার অস্তিত্ব টের পাওয়া যায়। ক্ষমতা কিছুটা আচরণকেন্দ্রিকও। অর্থাৎ ক্ষমতাশালী ও ক্ষমতাধীন ব্যক্তিদ্বয়ের সম্পর্ক বুঝতে হলে তাঁদের পারস্পরিক আচরণ এবং আচরণের প্রভাব ইত্যাদি বুঝতে হবে, নাহলে কে কীভাবে কার আচরণ পরিবর্তন করতে পারেন, তা বোঝা যাবে না। কনটেক্সট বা প্রতিবেশ অনুযায়ী ক্ষমতার ধরন ও ক্ষমতার চর্চা বদলায়। এই প্রতিবেশ হতে পারে অর্থনৈতিক, সামাজিক কিংবা সাংস্কৃতিক। দুইজন ব্যক্তির সম্পর্ক কোন পরিস্থিতিতে তৈরি হয়েছে এবং ক্রিয়াশীল থাকছে, এর বিশ্লেষণ না করলে ক্ষমতার প্রকৃতি বোঝা যাবে না। ক্ষমতা মানুষের এমন এক সামর্থ্য যা হয়তো এখনই প্রকাশমান নয়, ভবিষ্যতে প্রকাশ পেতে পারে। ক্ষমতার ধারণাটি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে কেউ কেউ ক্ষমতাকে ভবিষ্যতের ধারণা হিসেবে দেখেছেন। যেমন, সপ্তদশ শতাব্দীর ইংরেজ দার্শনিক টমাস হবস-এর মতে, 'Power of man's present means to any future apparent good.' (Foucault, 1995, P. 222)

বার্ট্রান্ড রাসেল ক্ষমতার প্রকাশ্যতার উপর বেশি গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তাঁর মতে 'Power is the production of Intended effects.' (রাসেল, ২০১৭, পৃ. ২৪)। ক্ষমতাশালী ব্যক্তির ক্ষমতার চরিত্র বুঝতে হবে কতখানি তিনি তাঁর অভিপ্রায় অনুযায়ী ক্ষমতাধীনের আচরণকে প্রভাবিত করতে পারেন।

হিজড়াগোষ্ঠীর মধ্যে ক্ষমতার দুটি রূপ দেখা যায়:

- নেতা বা গুরুর মধ্যে তা প্রকাশিত
- শিষ্য বা অনুসারীর মধ্যে তা প্রচ্ছন্ন

প্রত্যেক গুরু-মায়ের কাজের নির্দিষ্ট এলাকা থাকে। অনেক সময়েই দেখা যায়, এলাকা বড় হওয়ার কারণে গুরু-মা তার ওই এলাকার কোন বিশেষ অঞ্চলের দায়িত্ব তাঁর কোন শিষ্যের ওপর ছেড়ে দেন। দায়িত্বপ্রাপ্ত শিষ্য নতুন গুরু-মায়ের পদে উন্নীত হয়। গুরু-মা হওয়ার ইচ্ছা থাকলেও, সকল হিজড়ার সেই সৌভাগ্য হয় না। তবে গুরু-মা হওয়ার জন্যে শিষ্যদের মধ্যে নীরব ক্ষমতার সংঘাত থাকে। তবে শিষ্যের ক্ষমতা দেখানোর সুযোগ খুব বেশি থাকে না। তবে পরিস্থিতির কারণে ভবিষ্যতের গুরু-মা ঠিক করার আগেই যদি বর্তমান গুরু-মা মারা যান, তাহলে গুরু-মা হওয়ার জন্যে শিষ্যদের মধ্যে বিরোধ-বিবাদ দেখা দেয়। এমন ক্ষেত্রে বয়স্ক শিষ্যেরা নতুন-নতুন শিষ্য নিয়ে এসে নিজস্ব কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করার মাধ্যমে 'গুরু-মা' হিসেবে পরিচিত হয়ে ওঠার চেষ্টা করে। যে শিষ্য যতবেশি অনুসারী নিয়ে আসতে পারে তার ক্ষমতা তত বেশি। দৈনন্দিন জীবনে শিষ্য হিজড়াদের মধ্যে যে গণ্ডগোল হয় তার বিচারও গুরুই করে থাকেন। অন্যান্য হিজড়াগোষ্ঠীর সাথে শিষ্যদের সম্পর্ক কেমন হবে তাও নির্ধারণ করেন গুরু। কোনো কোনো বয়স্ক শিষ্য তাঁদের নতুন শিষ্যদের নিয়ে মহল্লা ছেড়ে অন্যত্র যায়, নতুন হিজড়া-বাড়ি গড়ে তুলতে। প্রয়াত গুরু-মায়ের শিষ্যদের মধ্যে পারস্পরিক বৈরি মনোভাব দেখা যায়। অনেক সময় বয়স্ক বা শারীরিকভাবে দুর্বল গুরু তাঁর যাবতীয় দায়িত্ব অনুগত বা বিশ্বস্ত কোনো শিষ্যকে দিয়ে দেন। গোষ্ঠীর ক্ষমতাকাঠামোতে এই অনুগত শিষ্যের স্থান হয় ঠিক গুরুর পরেই। তবে গুরুর প্রতি প্রায়ই শিষ্যদের বৈরি মনোভাব লক্ষ করা যায়, কিন্তু ক্ষোভ অবদমিত হয়। কারণ গুরুর সাথে বোঝাপড়া করার ক্ষমতা তাঁদের থাকে না। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক হওয়ায় ছদ্মনাম ব্যবহার করা এক হিজড়া বলেন:

> সারাদিন আমরা যত খাটন গুরুর তত লাভ। অর্ধেক টাকা তো গুরু নিজেই রেখে দিবে। গুরুর কোন কিছুর অভাব হয় না, অভাবে থাকি আমরা। এজন্য শরীর অসুস্থ থাকলেও আমাদের কাজে যাওয়া লাগে। (তথ্যদাতা: ফুল, তারিখ: ১৯-১-২০২২)

হিজড়া জনগোষ্ঠীতে ক্ষমতা মূলত গুরু-শিষ্য সম্পর্কের মধ্যে নিহিত। তবে এক্ষেত্রে গুরুপ্রথা পরম্পরাগত। আবার ভিন্ন ভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব রয়েছে। অনেক স্থানে গুরু নিজেরাও নির্বাচন করে নেয়। শিষ্যরা গুরু-মাকে এতটা মান্য করে যে তাঁর কথার অবাধ্য হওয়া শিষ্যের পক্ষে প্রায় অসম্ভব।

একটি ডেরায় গুরু-মার তত্ত্বাবধানে হিজড়া সম্প্রদায়ের দশ থেকে বিশ জন হিজড়া বসবাস করে। গুরু-মার নিয়ন্ত্রণে একটি ডেরার নিয়মকানুন পরিচালিত হয়। আকৃতিগত দিক থেকে ডেরা দু' ধরনের হয়ে থাকে। বড় ডেরা ও ছোট ডেরা। বড় ডেরায় একের অধিক কক্ষ থাকে। তার মধ্যে গুরু-মার নিজস্ব একটি কক্ষ থাকে। গুরুর চ্যালা বা শিষ্যদের জন্য একের অধিক কক্ষ নির্ধারিত থাকে। সেই কক্ষগুলোর মেঝেতে লম্বা বিছানা পাতা থাকে। এই বিছানায় ডেরায় বসবাসরত হিজড়া অর্থাৎ চ্যালা, চ্যালা-নাতনিরা সারিবদ্ধভাবে একসঙ্গে ঘুমায়। ছোট ডেরা এক কক্ষ বিশিষ্ট। তবে বড় এবং ছোট উভয় ডেরায় রান্নার জায়গা আলাদা থাকে। সেখানে রান্না করে গুরু-মাকে খাবার পরিবেশন করে। এরপর

গুরু-মা নিজে শিষ্যদের খাবার পরিবেশন করে। খাবার পরিবেশনের পর গুরু-মা নিজের আসনে গিয়ে বসে। খাবার গ্রহণের আগে শিষ্যরা গুরু-মাকে সালাম জানায়। গুরু-মা সবাইকে নিয়ে একসঙ্গে আহার করেন। এখানেও একটি অলিখিত ক্ষমতা সম্পর্ক বিদ্যমান। মানে গুরুর জীবনধারণ প্রক্রিয়ার সাথে শিষ্যদের জীবনধারণ প্রক্রিয়ার স্পষ্ট ক্ষমতার পার্থক্য বিদ্যমান।

হিজড়া সমাজের শ্রেণীবিন্যাস ও পারস্পরিক দ্বন্দ্ব

(ক্ষেত্রসমীক্ষা থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী)

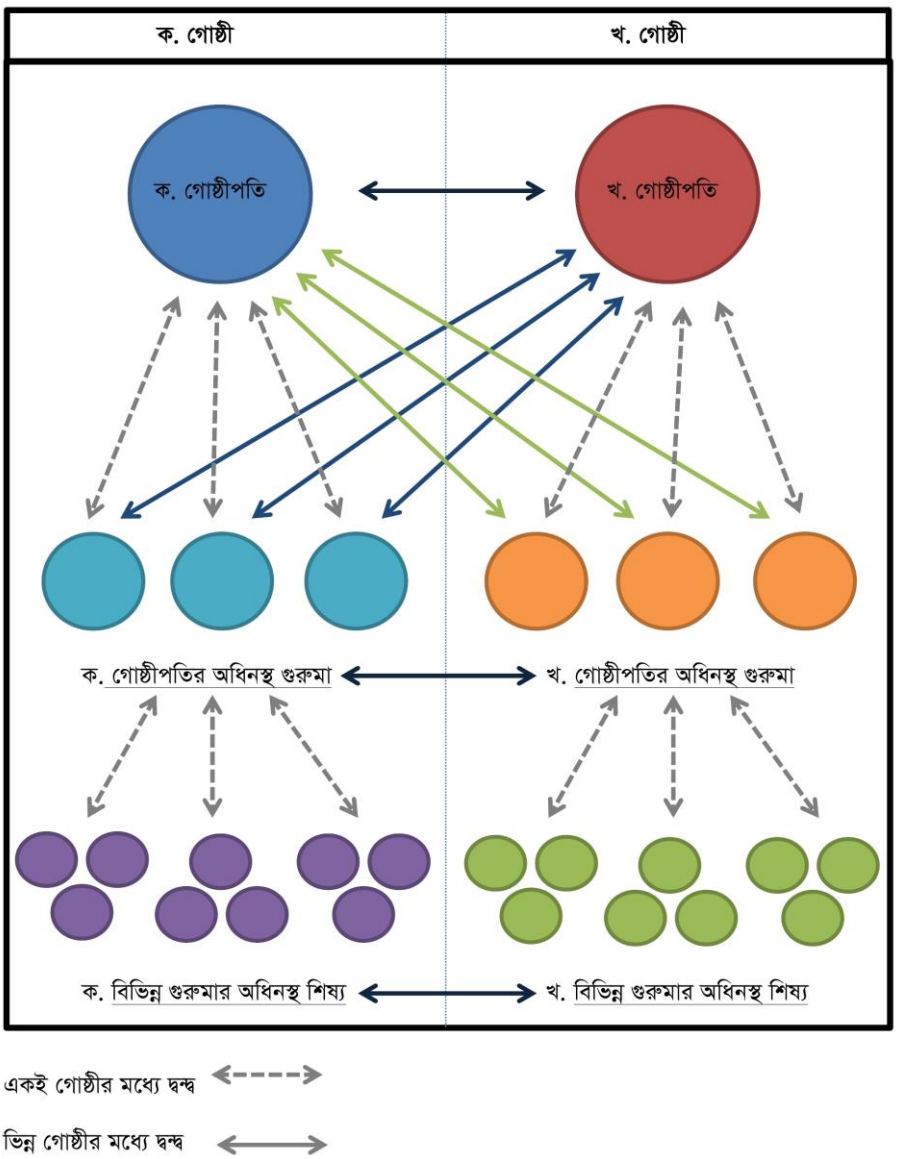

চিত্র ১

গুরু-মা তার দলের হিজড়াদের নিয়ন্ত্রণ করেন ফলে তাঁদের শাস্তি দেয়ার দায়িত্বও গুরুর। তাঁদের শাস্তি প্রক্রিয়ার নাম 'ডন', যা আসলে আর্থিক জরিমানা– যা ক্ষমতার সরাসরি প্রয়োগ। ডেরায় অবস্থানরত হিজড়ারা গুরু-মার নির্দেশ মেনে চলে। এর অন্যথা হলেই গুরু-মা কথায় কথায় হিজড়া চ্যালা, চ্যালা নাতনিদের উপর ডন পদ্ধতি প্রয়োগ করেন।

গুরু-মার কাছে হিজড়াদের অন্যায়, অপরাধের রকমভেদ রয়েছে। যে চ্যালা হিজড়া গুরু-মার মুখের উপর কথা বলে, তর্ক করে, আদেশ অমান্য করে তাকে জবান ধোলাই ডন ধার্য করা হয়। চ্যালা, চ্যালা-নাতি হিজড়া সন্ধ্যাবেলায় সন্ধ্যাবাতির সালাম না দিলে, হিজড়াগিরি বাদাই খাটা, ছল্লা খেটে যা রোজগার করে সেই আয় থেকে কোনো হিজড়া টাকা সরিয়ে ফেললে অথবা চুরি করলে তাকে ডন ধরা হয়। চ্যালা হিজড়াদের প্রতিটি কাজ সঠিকভাবে না হলে, চলাফেরায় ত্রুটি হলে, কথাবার্তায় দোষ পেলে গুরু-মা ডেরায় অপরাধী হিজড়ার বিচার করার জন্যে সালিশি ডাকে। গুরু-মা ডেরায় অবস্থানরত সকল হিজড়ার সামনে বিচারকার্য পরিচালনা করে। যেমন: কোনো হিজড়া নিজেদের মধ্যে মারামারি, হাতাহাতি করলে কেউ গুরু-মার শাড়ি পরলে কিংবা কোনো জিনিস ব্যবহার করার অপরাধে শাস্তিস্বরূপ ডন ধরা হয়। দোষী সাব্যস্ত হলে অপরাধের মাত্রা অনুযায়ী হিজড়ার ডন ধার্য করা হয়। কখনো কখনো বড় অঙ্কের ডনও করা হয়। গুরু-মা ডনের অর্থ নিজে অর্ধেক রেখে অপরাধী হিজড়া ছাড়া চ্যালা, চ্যালা-নাতনি হিজড়ারা যারা সালিশিতে উপস্থিত থাকে তাঁদের মধ্যে ভাগ করে দেন।

হিজড়া সংস্কৃতি মূলত একটি পেশাভিত্তিক সংস্কৃতি। ফলে এই সংস্কৃতির যাবতীয় নিয়ম পেশাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়। গুরু-মা নিজের ক্ষমতায় যেসব নিয়ম-কানুন শিষ্যদের উপর দিয়ে থাকে তাঁর বেশিরভাগটা জীবন ও জীবিকাকে কেন্দ্র করে। যার মূলে থাকে অর্থ। বিভিন্ন দ্বন্দ্ব-সংঘাতও হয় পেশাকে কেন্দ্র করে, টাকা উত্তোলনকে কেন্দ্র করে। যেমন, কোনো নবজাতকের বাড়িতে বাদাই খাটতে গেলে বা বিয়েতে গেলে কত টাকা তুলবে তা গুরু-মার নির্ধারিত। গুরু-মা বিভিন্ন দলে তার শিষ্যদের ভাগ করে দিয়ে, কোন এলাকায় কোন দল 'কালেকশন' করবে তাও ঠিক করে দেন। সেই দলের হিজড়ারা তাঁদের নির্দিষ্ট এলাকায় গিয়ে চাঁদা তোলে। সপ্তাহে একদিন হোটেলে, একদিন দোকানপাটে আবার কোনোদিন বাজারে গিয়ে বখশিশ নেয়। তোলা বা কালেকশনের মধ্যে মাছ, চাল, আলু ইত্যাদিও থাকে। একেকজন গুরুর আওতায় ১০-১৫ টা গ্রুপ পর্যন্ত থাকতে পারে। যে গুরুর গ্রুপ যত বড়, তাঁর ক্ষমতা তত বেশি। সারাদিন তোলা উঠিয়ে সকল দল তার সংগৃহীত তোলা নিয়ে গুরুর কাছে আসে। যে গ্রুপ যত টাকা নিয়ে আসতে পারে, গুরু তার প্রতি তত খুশি হয়। উত্তোলিত অর্থের অর্ধেক গুরু নিজে নিয়ে বাকিটা ওই গ্রুপকে দিয়ে দেন। এই বিষয়টিতেও গুরু-শিষ্যের মধ্যে অভ্যন্তরীণ যে অপ্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতা-সম্পর্ক এর প্রকাশ মেলে।

হিজড়াদের পেশাগত কারণে একই গোষ্ঠীর মধ্যেও দ্বন্দ্ব হয় আবার ভিন্ন ভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যেও দ্বন্দ্ব হয়। যেমন: ভিন্ন গোষ্ঠীর দুই গুরু। এক গোষ্ঠীর গুরুর সঙ্গে অন্য গোষ্ঠীর শিষ্য আবার দুই গোষ্ঠীর শিষ্যদের মধ্যে। তখন যে গুরুর 'ক্ষমতা' বেশি, সে-ই সাধারণত জয়ী হয়। এই দ্বন্দ্বগুলোর প্রধান কারণ, বাজার দখল। ক্ষমতার সম্পর্ক বিচার করে সাধারণভাবে বলা যায়, সমাজে এই সম্পর্ক অপ্রতিসম। কারণ ক্ষমতাবান আর ক্ষমতাধীনের সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ ও অধীনতামূলক। কিন্তু সমাজে এমন সম্পর্কের ঘটনাও তো বিরল নয় যে দু'পক্ষের

ক্ষমতা সমান সমান। দুই গুরু'র মধ্যে যখন ঝামেলা হয় তখন মূলত এটিই ঘটে থাকে। দুই গুরুর শিষ্য সংখ্যা সমান হলেও তাকে সমক্ষমতাসম্পন্ন গোষ্ঠীও বলে। কোন বাজার কে দখল করবে এ নিয়ে যখন সমক্ষমতাসম্পন্ন দুই দলে দ্বন্দ্ব হলে অন্য মহল্লা থেকে তুলনামূলক বয়োজ্যেষ্ঠ কোনো হিজড়া আসে, যে নিজেও আগে গুরু-মা ছিল। তিনি বিচার-বিবেচনা করে যে সিদ্ধান্ত দেন, সবাই তা মেনে নেয়।

গুরু-মার অবর্তমানে তাঁর সম্পত্তির ভাগ পায় শিষ্যরা। হিজড়া জনগোষ্ঠীর তেমন কোনো স্থাবর সম্পত্তি থাকে না, তারা পরম্পরাগতভাবে বাজারের উত্তরাধিকার দিয়ে যায়। কোনো গোষ্ঠীতে কার ক্ষমতা কতটুকু, তা বোঝা যায় অধস্তনদের উপর তার আচরণ দিয়ে। ফলে হিজড়াদের পেশায় যে কাঠামো রয়েছে, তাতে খুব স্পষ্টই বোঝা যায় এতে গুরু-শিষ্য, শিষ্য-শিষ্যর ক্ষমতাকাঠামো কতটা গুরুত্বপূর্ণ।

৪০ জন হিজড়ার ওপর করা একটি সার্ভে
(ক্ষেত্রসমীক্ষা থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী)

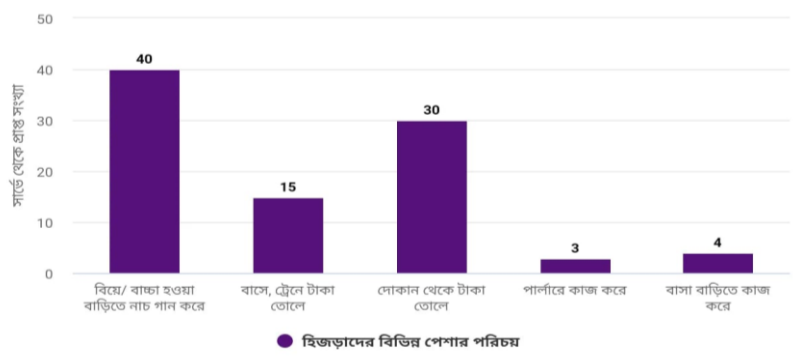

চিত্র ২

হিজড়া গুরু-মা ও শিষ্যের আয়
(ক্ষেত্রসমীক্ষা থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী)

উপার্জিত অর্থ ভাগের ভিত্তিতে		এলাকা ভাগের ভিত্তিতে
	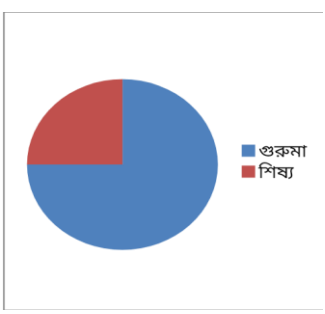	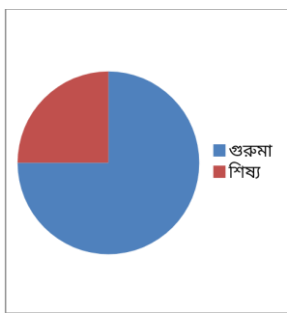

চিত্র ৩

ক্ষমতার সাথে খুব গুরুত্বপূর্ণভাবে যুক্ত আকাঙ্ক্ষা। কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠী যখন কারো থেকে কিছু আশা করে তখন তার সঙ্গে আন্তঃযোগাযোগপন্থা দেখেও ক্ষমতাসম্পর্ক বোঝা যায়। 'মূলস্রোত'-এর মানুষের ক্ষমতার সাপেক্ষে হিজড়ার ক্ষমতার কোন তুলনাই চলে না। অথচ অন্যান্য সকল গোষ্ঠীর সঙ্গে হিজড়ার আচরণ বা টাকা তোলার পন্থা ভিন্ন ভিন্ন হয়। সে নিজেও উল্টোদিকের মানুষটার সামাজিক ক্ষমতা অনুযায়ী তার সঙ্গে ব্যবহার করে। যেমন: হিজড়াগোষ্ঠী একজন রিকশাচালকের সাথে যে ব্যবহার করে, পাজেরো গাড়িতে চড়া ব্যক্তির সঙ্গে একই ব্যবহার করে না। আবার নারী ও পুরুষের সাথে ব্যবহারের তারতম্য থাকে। যখন দোকানে টাকা তুলতে যায় তখন পানের দোকানওয়ালার সাথে যে আন্তঃযোগাযোগ স্থাপন করে, একই যোগাযোগ একজন বড় কাপড় ব্যবসায়ীর সাথে করে না। অর্থনৈতিকভাবে নিচু অবস্থানে থাকা লোকের সাথে সে নমনীয় ব্যবহার করার প্রয়োজন বোধ করে না, যেটা করে ক্ষমতার উঁচুতে থাকা লোকের সাথে। ক্ষমতার পার্থক্যের সঙ্গে তার আকাঙ্ক্ষার পার্থক্যও হয়। একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, বেশভূষায় যদি সামাজিক ক্ষমতায় উঁচুস্তরে আছে এমন কাউকে দেখে তার সাথে শুরুতেই সে নমনীয় ব্যবহার করে। টাকা না পেলে তার 'সম্মানে' আঘাত করে। যেহেতু সমাজে 'হিজড়া ধরা' খুবই হাস্যকর এবং লজ্জার বিষয় হিসেবে পরিগণিত হয়, ফলে সেই ব্যক্তি চেষ্টা করে হিজড়াকে টাকা দিয়ে দিতে। কিন্তু ক্ষমতাকাঠামোয় নিচে থাকা লোকজনের সাথে তার ব্যবহার হয় জোর জবরদস্তি। হিজড়া নিজে নিম্নবর্গের হওয়ায় সে জানে সামাজিক স্তরে ক্ষমতাসম্পন্নরা তার সঙ্গে কেমন আচরণ করে, ফলে সে নিজেও অন্যান্য নিম্নবর্গদের সাথে একই আচরণ করে। ব্যতিক্রমটি ঘটে নারী-পুরুষ বাইনারির ক্ষেত্রে। সাধারণত সমাজে পুরুষের ক্ষমতা নারীর চেয়ে বেশি। কিন্তু নারীর উপর হিজড়া তার ক্ষমতা প্রয়োগ করে না, করে পুরুষের প্রতি। কারণ বেশিরভাগ হিজড়া নিজেকে নারী মনে করে। ফলে পুরুষের প্রতি অবদমন বেশি, আকাঙ্ক্ষাও পুরুষের প্রতি বেশি। আকাঙ্ক্ষিত পুরুষকে সে জীবনে পায় না, পাশাপাশি পুরুষের দ্বারাই সে নিগ্রহের শিকার হয়। তাই টাকা তুলতে গিয়ে বাজে ব্যবহার পুরুষের সাথেই করে, নারীর সাথে তুলনামূলকভাবে কম। বিভিন্নভাবে ক্ষমতাধীনকে প্রভাবিত করে থাকে ক্ষমতাবান। ক্ষমতাহীনকে উপনিবেশিত রাখার ইচ্ছা ক্ষমতাশালীদের মজ্জাগত। মানসিক এই ইচ্ছা সামাজিকভাবেও হিজড়াকে সমাজচ্যুত করে। প্রতিটি গোষ্ঠীর আন্তঃসম্পর্কে এটি ঘটে থাকে। এক গোষ্ঠীর সাথে আরেক গোষ্ঠীর অপ্রাতিষ্ঠানিক যোগাযোগের ক্ষেত্রেও এটি সমপরিমাণ সত্য।

হিজড়াদের সমাজবিচ্যুতি ও পেশাগত অভিযোজন: লোকসাংস্কৃতিক প্রবণতা

একটি লোকগোষ্ঠীর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন, অপ্রাতিষ্ঠানিক যোগাযোগ, বিশ্বাস, সুখ-দুঃখ, আচার-ব্যবহার, পেশা, দৈনন্দিন জীবনধারণ পদ্ধতি সবই ফোকলোর বিদ্যাশাখার আলোচ্য। হিজড়াদের মূলস্রোত থেকে বিচ্যুত অবস্থায় অন্য একটি স্বতন্ত্র গোষ্ঠীতে গিয়ে নিজের অবস্থান তৈরি করতে হয়। একটি হিজড়া গ্রুপের কেউ-ই জন্মগতভাবে একই গোষ্ঠীর সদস্য নয়। তাঁরা ভিন্ন ভিন্ন গোষ্ঠী থেকে এসে একই ধরনের আবেগ, অনুভূতি, ভাষা, ঐতিহ্য ধারণ করে একই লোকগোষ্ঠীর সদস্য হয়ে ওঠে।

ফোকলোর বিদ্যাশাখার প্রচলিত সংজ্ঞা এবং হিজড়াগোষ্ঠীর চর্চিত বিভিন্ন লোক উপাদানের দৃষ্টান্ত দিয়ে হিজড়াদের সমাজবিচ্যুতি ও পেশার স্বরূপ বিশ্লেষণ করা হলো যায়। ফোকলোরের কয়েকটি সংজ্ঞা উল্লিখিত হলো:

Folklore may refer to types of barns, bread molds or quilts to orally inherited tales, songs, sayings and beliefs and also to village festivals, house hold customs and rituals (R.M., 1959, P. 1)

Folklore is the generic to designate the customs, beliefs, tales, traditions, magical practices, proverbs songs etc. in short the accumulated knowledge of a homogenous unsophisticated people. All aspect of Folklore, probably originally the product or individuals, are taken by the Folk and put through a process of creation which through constand variation and repitition become group product. (Leach, 1949, P. 13)

(M) In Anthropological usage, the term Folklore has come to mean myths, legends, folktales, proverbs, riddles, verse and a variety of other forms of artistics expression whose medium is the spoken word. (রহমান, ২০১৮, পৃ. ১৫)

(N) The term 'folk' can refer/ to any group of people whatsever who shared at least one common factor. It does not matter what the linking factor is-it could be a common occupation, language or religion-but what is important is that a group formed for whatever reason will have some traditions which it calls its own. (Dundes, 1980, P. 6-7)

উপরের সংজ্ঞা এবং গবেষকের ধারণা অনুযায়ী, একটি 'ফোকগ্রুপ'-এর যতরকম বৈশিষ্ট্য থাকা উচিত এর সবগুলোই আছে হিজড়াগোষ্ঠীতে। যেমন:

- একটি হিজড়াগোষ্ঠীতে একে অপরের সঙ্গে নিজস্ব শিল্পায়ত ও অপ্রাতিষ্ঠানিক যোগাযোগ ব্যবস্থা রয়েছে।
- হিজড়াগোষ্ঠীর নিজস্ব পরম্পরাগত ঐতিহ্য রয়েছে। যেমন: তাঁদের পেশা।
- তাঁদের নিজস্ব ধর্ম, ভাষা, পেশা, সাজসজ্জা-পোশাক রয়েছে যার মাধ্যমে তারা একে অপরের সাথে যুক্ত। যেমন: ভাষা হিসাবে উল্টি, পেশা হিসাবে বাদনা খাঁটা। ধর্মীয় বিশ্বাস হিসেবে ঢোল পূজা।
- হিজড়াগোষ্ঠীর নিজস্ব জীবনব্যবস্থা রয়েছে যা তার প্রতিটি কর্মে প্রকাশ পায় অর্থাৎ সংস্কৃতির নিজস্বতা বিদ্যমান।
- হিজড়াদের বেশিরভাগ ঐতিহ্য মৌখিক পরম্পরাগত।
- হিজড়াগোষ্ঠীতে ফোকলোর উপাদান মূলত অবস্তুগত।

হিজড়াগোষ্ঠীর মূল সমাজ থেকে ভিন্ন সমাজে যাওয়ার পর গুরুর সাথে একটি অপ্রাতিষ্ঠানিক যোগাযোগ স্থাপন হয়। সেখানে কিছু নিয়ম আচার পালিত হয় যা শুধু সেই গোষ্ঠীতে পালন করা হয়। হিজড়াপল্লীতে নতুন কোনো শিষ্য আসার পরই তাঁর মাথায় কাপড় পেঁচিয়ে

তাকে শপথ করানো হয় যে সে গুরু-মায়ের সকল নির্দেশ মেনে চলবে। এরপর গুরু-মা তাঁকে হাততালি দেয়া শেখায়। এই হাততালিরও অনেক অর্থ রয়েছে। বলা যায় হিজড়াদের পরম্পরাগত ঐতিহ্য এই হাততালি। এই হাততালি তাঁদের একটি ভাষাও। বলা যায় অপ্রাতিষ্ঠানিক যোগাযোগের সাংকেতিক চিহ্ন। 'দু হাজার বছর আগে থেকে হিজড়া সম্প্রদায়ের মধ্যে হাততালির প্রচলন এসেছে।' (গুহ, ১৯৯৪, পৃ. ১৮)। এই হাততালির অনেক অর্থ রয়েছে, যা শুধু হিজড়াগোষ্ঠীর লোকেরাই বুঝতে পারে।

বাম হাতের তালু সোজা করে এর উপর ডান হাতের তালু বাঁকা করে জোরে শব্দ করে তালি দেয়া হয়। দলবদ্ধভাবে হিজড়ারা এই তালি দিয়ে থাকে। এই তালি বিপদে ঢাল হিসেবেও ব্যবহার হয় যেন একজন হিজড়া বিপদে পড়লে এই তালি শুনে আশেপাশের হিজড়ারা সাহায্য করতে ছুটে আসে। আবার এই হাততালি তাঁদের রাগ, ক্ষোভের প্রতীক।

পেশাভিত্তিক লোকবিশ্বাস ও লোকাচার

মানুষের মানসিক দুর্বলতা, সামাজিক অবস্থান, শুভ-অশুভবোধ এইসবের জন্য লোকবিশ্বাসের জন্ম হয়। বর্তমান গবেষণা-প্রবন্ধের জন্য অঞ্চলের মানুষ ভাগ্যে বিশ্বাসী। তাই সেই বিশ্বাস ও বোধ থেকেই লোকবিশ্বাস ও সংস্কারের প্রতি মানুষের এত আস্থা। লোকবিশ্বাস যেখানে একান্তভাবে একটি ধ্যান-ধারণা, লোকাচার সেখানে পালনীয় বিষয়। হিজড়াগোষ্ঠী ভাগ্যের দ্বারা নিজেদের বিড়ম্বিত মনে করে। জন্মগতভাবেই সে নিজেকে দুর্ভাগ্যবান ভাবে, সমাজ থেকে বিতাড়িত ভাবে ফলে তাঁর মনে ভয় আরো প্রবল হয়ে ওঠে। তাই হিজড়াগোষ্ঠীতে লোকবিশ্বাস ও লোকাচার চর্চিত হয় বেশি।

নবজাতক শিশুর জন্ম উৎসব, বিয়ে, প্রীতি ভোজ এবং নানা উৎসবে তিন তালি দেয়া হয় আনন্দ ও আশীর্বাদস্বরূপ। একজন হিজড়া নবজাতককে কোলে নিয়ে নাচার সময় অন্য হিজড়ারাও ঢোলের বাদ্যের তালে তালে নাচ-গানের মধ্যে কিছুক্ষণ পরপর হাততালি দিয়ে থাকে। নাচ-গান ঢোলের বাদ্যের সঙ্গে হাততালি দিয়ে ছন্দ তৈরি করে তাঁরা। এভাবে হাততালি হিজড়া সংস্কৃতিতে নিজস্ব সাংস্কৃতিক পরিচয়ের একটি বড় দিক।

দায়ের হিজড়া সম্প্রদায়ের একটি পবিত্র স্থান। হিজড়া সম্প্রদায়ের ঢোল রাখার স্থান অর্থাৎ কক্ষকে বলা হয় দায়ের। কারণ তাঁদের জীবিকা নির্বাহে এটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে। হিজড়া সম্প্রদায়ের বিচারকার্য পরিচালনা করা হয় এখানে। প্রতিদিন কাজে যাওয়ার আগে তাঁরা দায়েরে সম্মান জানায়। তারপর যার যার ঢোল নিয়ে বাদাই হুলা খাটতে বেরিয়ে যায়। হিজড়া সম্প্রদায়ের চ্যালা, চ্যালা-নাতনিরা কোলে করে নাচিয়ে বাদাই খেটে যে বখশিস পায়, কিংবা দোকান থেকে যা রোজগার করে তা দায়েরে নিয়ে আসে। কাজ শেষে দায়েরে এসে গুরু-মার হাতে তাঁদের উপার্জিত অর্থ তুলে দেয়।

হিজড়া জীবনের সঙ্গে 'ঢোল' গভীরভাবে সম্পৃক্ত। ঢোল বাজিয়ে এরা নাচ গান করে। আর তাই ঢোলকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে কিছু প্রথা। কর্মক্ষেত্র ছাড়া অকারণে গুরু-মায়ের সামনে ঢোল বাজালে বা হাতের তালি দিলে শিষ্যদের ক্ষতি হবে বলে বিশ্বাস। 'ঢোল' পায়ে লাগা 'পাপ'। সকালে, বিকেলে ঢোলকে হিজড়ারা প্রণাম করে। কোনো কোনো মহল্লায় কাজের শেষে ঢোলগুলিকে একটি নির্দিষ্ট জায়গায় রেখে সিঁদুরের ফোঁটা দেওয়া

হয়। সকালে কাজে বেরোনোর আগে কোন অ-হিজড়া যদি ঢোল স্পর্শ করে, তাহলে ওই ঢোল অপবিত্র হয়ে যায়। অন্য কেউ ঢোল কেড়ে নেওয়ার অর্থ বিপদ আসন্ন। মহল্লার গুরু-মায়ের সম্মতি ছাড়া শিষ্যরা ঢোল কিনতে পারে না।

হিজড়াদের বাচ্চা নাচিয়ে পয়সা রোজগার করার উপায়কে মুজরা করা বলে। তাঁরা শাড়ির আঁচল কখনো বাম পাশে নিয়ে ডান পাশের অংশ খোলা রাখে। কখনো শাড়ির আঁচল ডান পাশে নিয়ে বাম পাশের অংশ খোলা রাখে। ঢোলের তালে তালে কোমর দুলিয়ে একজন হিজড়া বাচ্চাকে কোলে নিয়ে নাচে। কুলার মধ্যে চাল নিয়ে ঘুরে ঘুরে নাচতে নাচতে কুলা সোজা করে। কুলা সোজা হলেও একটি চালও নিচে পড়ে না। তাঁরা ভাবে চাল নিচে পরলে বাচ্চার বৃদ্ধি দেরিতে হবে। বাচ্চা বাড়িতে গিয়ে যদি দেখে মেয়েশিশু তাহলে জবা ফুল দিয়ে আশীর্বাদ করে। তাহলে এই শিশু একদিন পুত্রবতী হবে বলে তারা মনে করে। অনেকসময় নবজাতকের মা হিজড়াদের কাছ থেকে তেল পড়া নেন। একজন হিজড়া হাতের তালুতে সরিষার তেল নিয়ে নবজাতকের মাথায় দিয়ে আশীর্বাদ করে। তাতে সন্তান সুস্থ থাকবে বলে বিশ্বাস করা হয়। কোনো হিজড়ার যখন কাজে যাওয়া শুরু হয় তখন গুরু-মা তাঁর নাক ফুটিয়ে দেন। বিশ্বাস করা হয় এতে তার পেশাগত জীবন সুন্দর হবে।

পেশাভিত্তিক লোকভাষা

প্রত্যেক 'লোক'-এরই ভাষা রয়েছে। তেমনি কিছু গোষ্ঠীরও নিজস্ব ভাষা রয়েছে। গোষ্ঠীগত ভাষার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে 'গোপনীয়তা'। প্রত্যেক ধর্মীয় গোষ্ঠী, পেশাগত গোষ্ঠী নিজেদের মত করে কিছু শব্দ এবং পরিভাষা তৈরি করে নেয় যা তাঁদের স্বতন্ত্রতার প্রকাশ কিন্তু একটি পেশার জন্য প্রায় পূর্ণাঙ্গ লোকভাষা তৈরি হিজড়াগোষ্ঠীর মতো অন্য গোষ্ঠীতে খুব কম দেখা যায়। এই ভাষার কোনো শব্দার্থ সাধারণত তাঁরা বলেন না। গোপন কথা বলার জন্য তাঁরা এই ভাষা ব্যবহার করে থাকেন। হিজড়াগোষ্ঠীর লোকভাষার নাম 'উল্টি ভাষা'। তাঁরা 'বহুচেরা মাতা' (হিজড়াদের লোকদেবতা)-র নির্দেশে এই ভাষা গোপন রাখেন। কিন্তু দেখা যায় এই ভাষার অনেক শব্দ জীবিকাকেন্দ্রিক:

আধাটেংরি-দশ টাকা
আধা টেংরি এক-এগারো টাকা
ঝলকা-টাকা
কোনকি-পয়সা
চিলকা-বাচ্চা
এক গজ-একশ টাকা
ডামরী-ঢোল
ডেমোর-পুলিশ
হিলকর-চুপ (দাশগুহ, ১৯৯২, পৃ. ১৪)

উল্লিখিত শব্দগুলো হিজড়ারা 'কালেকশন' এর সময় ব্যবহার করেন। হিজড়াদের লোকভাষা দেখলে মনে হয়, এই ভাষা তৈরিই হয়েছে তাঁদের পেশাগত সুবিধার জন্য। তবে লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, হিজড়ারা নিজেদের তৈরি গানে এই ভাষা ব্যবহার করেন না। 'তিন তালি'

তাঁদের সাংকেতিক ভাষা। কখনো যদি সাধারণ কথোপকথনের মাঝে তারা এই হাততালি দেয় তবে বুঝতে হবে তারা পাশের হিজড়াকে থামতে বলছে। যদি গুরুর মুখের উপর হাততালি দেয়া হয় তবে বুঝতে হয়, তারা গুরুকে অপমান করছে।

পেশাভিত্তিক লোকসংগীত

লোকগোষ্ঠীর গান লোকসংগীত। বাদ্যযন্ত্র লোকসংগীতের ভিত্তি। এরমধ্যে আনদ্ধ বাদ্যবিশেষ উল্লেখযোগ্য। হিজড়াদের পেশায় ব্যবহৃত গানে প্রধানতম লোক বাদ্যযন্ত্র ঢোল, যা নিজেও আনদ্ধ শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত। সংহত গোষ্ঠীবদ্ধ সমাজের প্রতিবেশ, মানসিক অবস্থান ও শিল্পবোধের স্বতঃস্ফূর্ত রূপ লোকসংগীত। হিজড়াদের পেশাভিত্তিক গানগুলো বেশিরভাগ ক্ষেত্রে নিজের আবেগের প্রকাশ হয় না, স্বতঃস্ফূর্ত সৃষ্টি এমনও বলা যায় না। কারণ গানগুলো পেশাগত কারণে অনেকটা বাধ্য হয়েই তৈরি। এ কারণেই তাঁদের স্বতন্ত্র সংগীত খুব বেশি নেই। আবার অন্যদিকে এই গানগুলোর ভাষায় নিজের আবেগ-অনুভূতি যতটা তৈরি হয়, তার চেয়ে অনেক বেশি চেষ্টা থাকে শ্রোতার মনোরঞ্জনের। কোনো গানেই যে তাঁদের আবেগ, অবদমন প্রকাশিত হয় না এমন নয়; তবে গানের কথা শুনলে বোঝা যায়, মূল উদ্দেশ্য থাকে শ্রোতাকে বিনোদন দেয়া।

বেশিরভাগ পেশাগত লোকসংগীত হয় নিজের পণ্যের প্রচারের জন্য। যে কারণে গানগুলোতে পণ্যের বিজ্ঞাপন থাকে। যেমন: হকারের গান। ইদানীং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বাদাম বিক্রেতার ভাইরাল হওয়া একটি গান 'বাদাম বাদাম/ দাদা কাঁচাবাদাম/আমার কাছে নাইগো বুবু– ভাজা বাদাম'। কিন্তু এদিক থেকেও ব্যতিক্রম হিজড়াদের গান। তাঁরা নিজেকে পণ্য বানিয়েই অন্যদের আনন্দিত করে। সে নিজেই পারফরম্যান্স করে টাকা উপার্জন করে। ফলে তাঁদের গানে কোনো পণ্যের বিজ্ঞাপন থাকে না। তাই এই গান অন্যান্য পেশাগত লোকসংগীতের চাইতে আলাদা। বিয়েবাড়িতে উপস্থাপন করা হিজড়া সংগীত নিম্নরূপ:

মাহাল্লাতে রাইখ্যা আইছে কাইট্যা পাংখা জোড়া,
পংখীরাজে হয় সোয়ার বান্দর মদনকুমার ফুলমালা আর বান্দরী নয় শাহজাদী গুলশান
নাইচ্যা নাইচ্যা শাহজাদী পেরেশান। (তথ্যদাতা: রুবিনা, তারিখ: ১৮-১-২০২২)
আমার ষোল পেরিয়ে গেছে,
আমার ষোল পেরিয়ে গেছে,
বাবুরে...
আমার দাও বিয়া রে... (তথ্যদাতা: রুবিনা, তারিখ: ১৮-১-২০২২)

পেশাভিত্তিক লোকদেবতা

তাঁরা ঢোলকে দেবতার আসনে রেখে পূজা করে। কারণ তাঁরা বিশ্বাস করে এই ঢোলের জন্যই তাঁদের খাবার জোটে। কালীপুজোর রাতে হিজড়ারা ঢোলের আরাধনায় বসে।

এইদিন সাধারণত তাঁরা কাজে যায় না। সকাল থেকেই ঘরদোর পরিষ্কার করা শুরু হয়। যে স্থানে পুজো হবে, তাকে বিশেষভাবে পরিচ্ছন্ন করা হয়। এইদিন আমিষ নিষিদ্ধ। শিষ্যরা দল বেঁধে বেরিয়ে যায় আতপ চাল, পান, সুপারি, মাটির প্রদীপ, বাতাসা, ফল, ধূপ, মোমবাতি প্রভৃতি পুজোর বিভিন্ন উপকরণ কিনতে।

সাধারণত ঢোল পুজোর অনুষ্ঠানে বাইরের কেউ প্রবেশ করার সুযোগ পায় না। সন্ধে ছ'টা থেকে সাতটার মধ্যেই অধিকাংশ হিজড়া-বাড়িতে পুজো শুরু হয়। গুরু-মায়ের তত্ত্বাবধানে শিষ্য-মেয়েরা নতুন শাড়ি পরে নির্দিষ্ট জায়গায় পুজোর সমস্ত উপকরণগুলিকে জড়ো করে। এরপর দেওয়ালে তেল-সিঁদুর দিয়ে মঙ্গলসূচক ঊর্ধ্ববাহু মানুষের তিনটি মূর্তি আঁকে। এরই সামনে এই বাড়ির সমস্ত ঢোলকে সাজিয়ে রাখে। ঢোলের গায়ে একটি করে তেল-সিঁদুরের ফোঁটা দেওয়া হয়। উল্লেখ্য, প্রতি বছর এই ঢোল পুজোর আগেই ঢোলগুলিকে 'ছেয়ে' নিতে হয়। অর্থাৎ, নতুন চামড়া লাগানো হয়। প্রতিটি ঢোলের সামনে একটি করে পান পাতা রাখা হয়। প্রতিটি পান পাতার ওপর তেল সিঁদুরের পাঁচটি ফোঁটা দিয়ে, সেখানে একটি সুপারি, একটি বাতাসা এবং আরো কিছু ফল রাখা হয়। প্রতিটি পান পাতার নৈবেদ্যর সামনে একটি করে মাটির প্রদীপ ও মোমবাতি থাকে। পাশে বড় গামলা বা ধামায় থাকে খই। থালায় থাকে কাটা ও গোটা ফল। এইদিন দীপাবলীর রাত। প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী এইদিন হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে প্রদীপ বা মোমবাতি দিয়ে বাড়ি সাজাবার রেওয়াজ আছে। ঢোল পুজোয় গোছগাছ হয়ে যাওয়ার পরই, গুরু-মা কয়েকজন শিষ্য নিয়ে বাড়ির বিভিন্ন জায়গায় মোমবাতি জ্বালিয়ে দেন। এরপর পূজোর বেদীতে প্রতিষ্ঠিত প্রদীপ ও মোমবাতিগুলি জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। শিষ্যরা এক-এক করে এসে সাজিয়ে রাখা ঢোলগুলিকে প্রণাম করে। এরপর গুরু-মা পুজোয় বসেন। পুজোর কোনও মন্ত্র নেই। পূজোর নৈবেদ্য বা ডালিগুলো নদীতে ভাসিয়ে দেয়া হয়। এই পূজায় কোন শাস্ত্রীয় মন্ত্র নেই, পুরোহিত নেই। গুরু-মা নিজেই পুরোহিত। এ থেকে বোঝা যায় এই পূজা লৌকিক। এছাড়া হিজড়াদের মাজারের প্রতি একধরণের ভক্তি আছে, বিশেষত মুসলিম হিজড়াদের। এর কারণ শাস্ত্রীয় কোন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে (মসজিদ, মন্দির) তাঁদের প্রবেশাধিকার সহজ-সাবলীল নয়। তবে এর সঙ্গে তাঁদের পেশাগত তেমন কোন সাযুজ্য লক্ষ করা যায় না।

ভিয়েনার চিকিৎসক সিগমুন্ড ফ্রয়েড বিভিন্ন মানসিক রোগের চিকিৎসা করতে গিয়ে মনঃসমীক্ষণ তত্ত্ব আবিষ্কার করেন। ফ্রয়েডের মতে, মানুষ যে মনটাকে চেনে, বোঝে– অর্থাৎ যে মনটার মধ্যে 'ইচ্ছা', 'আবেগ' এসব জেগে ওঠে তা হলো 'চেতন-মন'; সেই চেতন-মনের গভীরে থাকে আরেকটা 'অবচেতন-মন'– যার অস্তিত্ব কদাচিৎ টের পাওয়া যায়। অবচেতন মনের পুঞ্জীভূত আবেগই হলো মানসিক বহু অবদমনের কারণ। মানুষের দৈনন্দিন জীবনের কাজ-কর্ম, ব্যবহার, আচার-আচরণ, তার তৈরি বিভিন্ন টেক্সটের মধ্যে তার অবদমিত মনের আকাঙ্ক্ষা খুব স্পষ্টরূপে বোঝা যায়। মানুষ তার মনের অতৃপ্ত প্রেম, না পাওয়া, ক্ষোভ, যৌন-কামনাকেও অবদমিত করে চেতন মন থেকে অবচেতন মনে পাঠিয়ে দেয়। (ফ্রয়েড, ২০০২, পৃ ১০-১৫)। এছাড়াঃ

> ফ্রয়েড তথাকথিত বিবেক, বাবা-মায়ের নৈতিক উপদেশ, সমাজবিধান, জীবনের আদর্শবোধ– এগুলিকে একসঙ্গে 'অধিশাস্তা' নামে অভিহিত করেন। এর প্রধান কাজ হলড়

> শৈশবের শিক্ষালব্ধ নীতিবোধ এবং আদর্শ অনুযায়ী অহমকে পরিচালিত করা। (সেন, ২০০৮, পৃ. ৪২)

সিগমুন্ড ফ্রয়েড তাঁর অবচেতন মনের ব্যাখা করার সময় পুরাণ লোককথা, ট্যাবু, সংস্কার ইত্যাদি বিষয়াদিকে উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করেছেন। অসংখ্য ফোকলোরবিদ ফোকলোরের নানাবিধ উপাদান ব্যাখ্যা করতে মনঃসমীক্ষণ তত্ত্ব ব্যবহার করেছেন। যেমন: বারোমাসি গান ও লোককথায় এ মনঃসমীক্ষণ তত্ত্ব ব্যবহার করা হয়।

মনঃসমীক্ষণ তত্ত্ব দিয়ে ফোকলোর বিশ্লেষণ করা হয়েছিল বিভিন্ন symbol বা প্রতীকের সাহায্যে, এতে একটি শব্দ দিয়ে অন্য অনুভূতি বুঝে নেয়া যায়। যেমন: লাঠি, গাছ, ফুল, গুহা, মৌমাছি এগুলো যৌনাঙ্গ ও যৌনতার বিভিন্ন প্রতীক। এসব প্রতীক এবং টেক্সটের আবেদন দ্বারা ওফ, অবচেতন আকাঙ্ক্ষা, অবদমিত যৌন ইচ্ছা, অবদমিত প্রেম বেরিয়ে আসে। হিজড়াগোষ্ঠীর ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম নয়। হিজড়াদের পেশায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশজুড়ে রয়েছে গান। এই গানেও তার ব্যক্তিজীবনের হতাশা উঠে আসে। যেমন: সংসার না হওয়া, সন্তান না হওয়া। এমনকি সে নিজেকে মন থেকে নারী-ই ভাবে তাও উঠে আসে।

> না আসলা অভাগীর বন্ধু
> বিদেশ পরে রইলা যে
> দিন দিন যৌবন যায় জ্বলে রে
> আর কতকাল সামলায়া রাখি
> আমার মনের জ্বালা রে (তথ্যদাতা: অভাগী, তারিখ: ১৭-১-২০২২)
> দিদিলো খোকা হয়েছে না খুকী হয়েছে
> খোকার পিসি খুকীর মাসি খবর পেয়েছে
> ঢাক ঢোল নিয়ে নাচতে এসেছে
> কোন বা দেশে বিধি একটি হিজড়া বানিয়েছে
> ঢাক ঢোল নিয়ে হিজড়া নাচতে এসেছে
> ও দিদিলো খোকা হয়েছে না খুকী হয়েছে। (তথ্যদাতা: নূরি, তারিখ: ১৬-১-২০২২)

বেশিরভাগ হিজড়া নিজেকে মেয়ে ভাবতে পছন্দ করে এবং তার যাবতীয় আকর্ষণ থাকে একজন পুরুষের প্রতি। যদিও কোন হিজড়া যদি মন থেকে নিজেকে মেয়ে না-ও ভেবে থাকে, তবুও পেশাগত কারণে তাকে মেয়ে ভাবতে হয়। তারা বিশ্বাস করে এতে পুরুষরা আকৃষ্ট হয়ে বেশি টাকা দেয়। কিন্তু সাজ মূলত হিজড়াদের নারী হয়ে উঠার অবদমিত ইচ্ছার ফসল। তারা নিজেকে যেভাবে দেখতে চায় নিজে নারী হয়ে উঠে নিজেকে

সেভাবেই দেখতে পায়। মনঃসমীক্ষণ তত্ত্ব অনুযায়ী ব্যাখ্যা করলে দাঁড়ায়, একজন পুরুষের শরীরি-নারী হয়ে উঠার যে আকুতি, তাই সাজের মধ্য দিয়ে বেরিয়ে আসে।

'সমাজবিচ্যুত' একজন মানুষ 'হিজড়া' পরিচয় ধারণ করে তার বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সাযুজ্য রয়েছে এমন গোষ্ঠীতে গিয়ে। বলা যায় সেখানে অন্য হিজড়াদের সঙ্গে নিজের সম্পর্ক স্থাপন করে কিছু পারস্পরিক সাধারণ বৈশিষ্ট্যের কারণে। যেসব বৈশিষ্ট্য শুধু সেই গোষ্ঠীর স্বতন্ত্র চিহ্ন। সেই গোষ্ঠীতে পরম্পরাগতভাবেই একই লৈঙ্গিক সত্তার অধিকারী। তাঁদের পেশায় কিছু পটপরিবর্তন ঘটলেও পেশাভিত্তিক বিশ্বাস, ধরন ও আকাঙ্ক্ষা একই। ফলে হিজড়াগোষ্ঠীকে নিঃসন্দেহে একটি লোকগোষ্ঠী বলা যায়, তাঁদের সমাজবিচ্যুতি ও পেশাগত অভিযোজনে বহুবিধ লোক-উপাদান উৎপাদিত ও বাহিত হয়।

গবেষণা-ফল

সমাজে নারী ও পুরুষের বাইরে ভিন্ন লৈঙ্গিক সত্তা ও ভিন্ন যৌন আচরণের মানুষকে হিজড়া বলে চিহ্নিত করা হয়। পৃথিবীজুড়ে সংখ্যালঘু পৃথকীকরণ ও 'অপর' করার যে প্রচেষ্টা– লৈঙ্গিক সংখ্যালঘু হিজড়াদের ক্ষেত্রেও প্রক্রিয়াটি একই। যেমন: বাউলদের সাংস্কৃতিক ভিন্নতার কারণে তাঁদের 'পাগল' বলা হয়, একইভাবে হিজড়াদের লৈঙ্গিক ভিন্নতার কারণে 'প্রতিবন্ধী' বলে সমাজবিচ্যুত করা হয়।

হিজড়াদের অভ্যন্তরীণ ক্ষমতাকাঠামোতে গুরু-মা ক্ষমতাশীল, শিষ্য ক্ষমতাহীন। আর সমাজের মূলস্রোতের কাছে হিজড়াগোষ্ঠীই ক্ষমতাহীন। সামাজিক কাঠামোতে নারী-পুরুষ বাইনারির সাথে তাঁদের সম্পর্ক 'উপনিবেশকারী-উপনিবেশিত'-এর মতো।

হিজড়াগোষ্ঠীতে পারস্পরিক শিল্পায়িত-অপ্রাতিষ্ঠানিক যোগাযোগ ও পরম্পরাগত ঐতিহ্য রয়েছে। ফলে হিজড়াগোষ্ঠী লোকগোষ্ঠী। তাঁদের ঐতিহ্য অবস্তুগত এবং মৌখিক পরম্পরাগত। হিজড়াদের সমাজবিচ্যুতি ও পেশাগত অভিযোজনের প্রতিটি পদে জড়িয়ে আছে বহু স্বতন্ত্র লোকবিশ্বাস, দর্শন, লোকভাষা, লোকসংগীত।

উপসংহার

হিজড়া জনগোষ্ঠী একটি স্বতন্ত্র লোকগোষ্ঠী। পরম্পরাজাত এই লোকগোষ্ঠীর সমাজিবিচ্যুতিকরণ ও পেশার পরতে পরতে রয়েছে বিভিন্ন অবস্তুগত লোক-উপাদান। তাঁদের পেশানির্ভর যে উপস্থাপনারীতি তাও পারফর্মিং বা উপস্থাপনাগত ফোকলোরের অংশ। অথচ মূল সমাজের অন্যান্য লোকগোষ্ঠীও তাকে লোকগোষ্ঠী হিসেবে মেনে নেয় না। এই লোকগোষ্ঠী লৈঙ্গিক পরিচয়ে ব্যতিক্রম এবং নিম্নবর্গ। সমাজের প্রচলিত স্টেরিওটাইপের সঙ্গে মেলে না বলে তাঁদেরকে সমাজ থেকে পৃথক করে দেওয়া হয়। শুরু হয় তাঁদের একঘরে জীবন। ক্ষমতাশীলরা সবকিছুকে নিজের ছাঁচে সাজাতে চায়, 'অন্য'-দের উপর আধিপত্য স্থাপন করতে চায়। বহুত্ববাদ বা বৈচিত্র্য সংখ্যাগুরু সম্প্রদায় কখনোই মানতে পারে না। দিন দিন নিগ্রহের শিকার হয়ে হিজড়া জনগোষ্ঠীও হয়ে ওঠে হিংস্র। এই হিংস্রতা

তাকে মূলস্রোত থেকে সরিয়ে দেয়। কোন ক্ষমতাকাঠামো সমঅধিকারের ক্ষমতাকাঠামো হয় না। সেই ক্ষমতা– অর্থ, শিক্ষা, সামাজিক প্রতিপত্তি বা ধর্ম যা-ই হোক না কেন। ক্ষমতাকাঠামোর বিষয়টিও আপেক্ষিক, অর্থাৎ কার সাপেক্ষে কে ক্ষমতাবান। হিজড়া জনগোষ্ঠী যেরকম মূলস্রোতে ক্ষমতাহীন, একইভাবে তাঁদের গোষ্ঠীতে তারা গুরু-মার ক্ষমতার কাছে ক্ষমতাহীন। ক্ষমতা যেহেতু নির্দিষ্ট করা খুব কঠিন কাজ, ফলে সমঅধিকারের সমাজ পাওয়াও প্রায় অসম্ভব। কিন্তু বৈচিত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া এতটাও কঠিন নয়। তাহলে অন্তত সমক্ষমতার না হলেও সমাজবিচ্যুত হতে হবে না হিজড়াকে। হিজড়াদের যেরকম মূলস্রোতের যে-কোনো পেশায় অন্তর্ভুক্তিকরণ সম্ভব, তেমনি হিজড়াদের পরম্পরাগত পেশাকেও (বিয়ে বাড়িতে, বাচ্চা- বাড়িতে গান নাচ) স্বাভাবিক পেশা হিসাবে মূল সমাজে অন্তর্ভুক্তিকরণ সম্ভব। যেভাবে একটি বিয়েবাড়িতে ঐতিহ্যিক মেয়েলি গীত হয়, তেমনভাবেই হিজড়া গানও 'স্বাভাবিক' করে নেয়া যেতে পারে। কিন্তু তথাকথিত মূলস্রোতের মানুষের বৈচিত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল মানসিকতা না এলে তা কোনোদিন সম্ভব হবে না।

তথ্যসূত্র

করিম, আনোয়ারুল (২০০২)। *বাংলাদেশের বাউল সমাজ*। বর্ণায়ন, ঢাকা।

গুহ, পথিক (১৯৯৪)। "ছেলে কিংবা মেয়ে ইচ্ছা মতোন"। *দেশ পত্রিকা* (সাগরময় ঘোষ, সম্পা.)। বর্ষ: ৬১, সংখ্যা: ২১। কলকাতা।

চৌধুরী, ফখরুল (২০০৭)। *উপনিবেশবাদ ও উত্তর-ঔপনিবেশিক পাঠ*। র‍্যামন পাবলিশার্স, ঢাকা।

দাশগুহ, পিনি (১৯৯২)। *হিজড়ে কথা*। উৎস মানুষ, ঢাকা।

ফ্রয়েড, সিগমুন্ড (২০০২)। *মনঃসমীক্ষা: প্রথম ও দ্বিতীয় পর্ব* (আবদুল গনি হাজারী, অনু.)। অবসর প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা।

রশীদ, মামুন অর (২০১২)। *উত্তর-আধুনিকতা উত্তর-ঔপনিবেশিকতা নিম্নবর্গ*। শুদ্ধস্বর, ঢাকা।

রহমান, কে এম বদিয়ার (২০১৮)। *ফোকলোর তত্ত্ব ও বাংলা সাহিত্য*। কথাশিল্প, ঢাকা।

রাসেল, বার্ট্রান্ড (২০১৭)। *ক্ষমতা* (শেখ মাসুদ কামাল ও কাজী রেহেনা মাসুদ, অনু.)। বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র, ঢাকা।

শাস্ত্রী, ক্ষিতিমোহন সেন (১৯৪৯)। *বাংলার বাউল*। নবযুগ প্রকাশনী, ঢাকা।

সেন, সৌমেন (২০০৮)। *লোকসংস্কৃতি: তত্ত্ব-পদ্ধতি*। অঞ্জলি পাবলিশার্স, কলকাতা।

Ashcroft, Bill, et al (2013). *Postcolonial Studies: the Key Concepts*. Routledge, London.

Devices, k (2005). *The Orientalists: Western Artists in Arabia, the Sahara, Persia & India*. Laynfaroh, New York.

Dundes, Alan (1980). *Interpreting Folklore*, Indiana University Press, Indiana.

Fanon, Franze (1986). *Black Skin White Mask*. Pluto Press, London.

Faucoult, M. and A. Sheriden (1995). *Discipline and Punish: The Birth of The Prison* (Alan Sheridan, Trans.). Vintage books, London.

Leach, Mac Edward (1949*). Standard Dictionary of Folklore, Mythology and Legend*. Funk and Wagnalls, New York.

R.M, Dorson (1959). *American Folklore*. Chicago Press, Chicago.

Said, E (1994). *Culture and Imperialism*. Vintage Books, London.

ক্ষেত্রসমীক্ষার তথ্যদাতা

১৫ জানুয়ারি ২০২২, তথ্যদাতার নাম- শিমু, বয়স- ২১, পেশা- হিজড়াবৃত্তি, ঠিকানা- নেত্রকোনা।

১৬ জানুয়ারি ২০২২, তথ্যদাতার নাম- নূরি, বয়স- ২৩, পেশা- হিজড়াবৃত্তি, ঠিকানা- নেত্রকোনা।

১৭ জানুয়ারি ২০২২, তথ্যদাতার নাম- অভাগী, বয়স- ২৬, পেশা- হিজড়াবৃত্তি, ঠিকানা- নেত্রকোনা।

১৭ জানুয়ারি ২০২২, তথ্যদাতার নাম- শাম্মী, বয়স- ৩০, পেশা- হিজড়াবৃত্তি, ঠিকানা- ময়মনসিংহ।

১৮ জানুয়ারি ২০২২, তথ্যদাতার নাম- রুবিনা, বয়স- ২২, পেশা- হিজড়াবৃত্তি, ঠিকানা- নেত্রকোনা।

১৮ জানুয়ারি ২০২২, তথ্যদাতার নাম- সাবিনা, বয়স- ২৮, পেশা- হিজড়াবৃত্তি, ঠিকানা- নেত্রকোনা।

১৯ জানুয়ারি ২০২২, তথ্যদাতার নাম- ফুল, বয়স- ২৭, পেশা- হিজড়াবৃত্তি, ঠিকানা- ত্রিশাল।